বিষচক্র

মাসুদ রানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

সী অভ মারমারা হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে চলেছে এস এস ব্ল্যাকবার্ন। আবহাওয়া খারাপ তা বলা যাবে না, পানি সামান্য ফেঁপে উঠেছে মাত্র, আসলে এস এস ব্ল্যাকবার্ন অত্যন্ত পুরোনো জাহাজ। তারওপর কোনও কার্গো নেই এখন জাহাজে, ব্যালাস্টও ঠিক নেই, অবহেলার সঙ্গে যা রাখা হয়েছে, সেটা পর্যাপ্ত নয়। বো'টা নিচু হয়ে আছে, প্রতিটা ঢেউয়ে নাক চুবাচ্ছে পানিতে, ভেজা কুকুরের মতো পানি ছিটিয়ে আবার নাক তুলছে। আয়ু শেষ হয়ে গেছে জাহাজটার। সুপারস্ট্রাকচারে কোনও রং নেই। তার বদলে আছে জং। প্লেটগুলো খসে আসবার জোগাড়। প্রতিটা ঢেউয়ের বাড়িতে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করছে। ফুটোফাটা দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে সাগরের পানি ঢুকছে। পাম্পগুলো চলছে সর্বক্ষণ, কোনওরকমে ভাসিয়ে রেখেছে ব্ল্যাকবার্নকে। তবুও ওটার এই যাত্রার একটা আলাদা মহিমা আছে। সমাধিক্ষেত্রের দিকে চলেছে ব্ল্যাকবার্ন। এটাই জাহাজটার অন্তিম যাত্রা।

ব্ল্যাকবার্নের দুরবস্থা নিয়েই আলেকযান্দ্রিয়ায় চাকরি নেওয়া নতুন অয়েলারের সঙ্গে কথা বলছে সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার। এই খানিক আগে গুমোট ইঞ্জিন রুম থেকে সিগারেট ফুঁকতে খোলা ডেকে বেরিয়ে এসেছে তারা দু'জন। এখন দাঁড়িয়ে আছে পুরোনো

ধাঁচের উঁচু ব্রিজের কাছে।

সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার তেতো টাইপের মানুষ। বেশি কথা বলে না। কিন্তু নতুন অয়েলারের ব্যাপারে কৌতূহল তাকে আলাপে আগ্রহী করে তুলেছে।

জোসেফ হলব্রিজ অয়েলারের নাম।

নাহ্, অসম্ভব, ভাবছে ইঞ্জিনিয়ার, এটা এ-লোকের আসল নাম হতেই পারে না। লোকটা আগে কখনও অয়েলারের কাজ করেছে বলেও মনে হচ্ছে না তার। তবে স্বীকার করতেই হবে, খুব দ্রুত নিজের কাজ বুঝে নিয়েছে লোকটা।

ব্ল্যাকবার্নের কিপটে মালিকও সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ারের কৌতূহল উদ্রেক করবার একটা কারণ। ওই হাড়কিপটে লোকটা বাড়তি লোক নেবে? কেন নেবে? সে ভালো করেই জানে, এস এস ব্ল্যাকবার্নকে কবরস্তানে নিয়ে যাওয়ার মতো ক্রু জাহাজে আছে। তারপরও নতুন একজন অয়েলারকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। আলেকযান্দ্রিয়ায় জাহাজে এসে উঠেছে লোকটা। এতো স্বল্পভাষী মানুষ সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার আগে কখনও দেখেনি।

প্রশ্ন করে জেনে নেবার জন্য মনটা উসখুস করছে সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ারের। কিন্তু অয়েলারের ব্যক্তিত্বে কোথায় যেন অদ্ভুত একটা কঠোরতা আছে, প্রচ্ছন্ন বাধাটা ডিঙানো যাচ্ছে না।

লোকটার আকার বা চলাফেরা কি তাকে কৌতূহলী করে তুলেছে? আনমনে নাকচ করে দিল ইঞ্জিনিয়ার চিন্তাটা। এর চেয়ে অনেক বড় আকারের লোক সে দেখেছে জীবনে। এর চেয়ে পেশিবহুল লোকও দেখেছে। তাদের চলাফেরাতেও ছিল দুর্দমনীয় পৌরুষ। ওসব তাকে সতর্ক হতে বাধ্য করছে না। আসলে লোকটার চোখ। ওই অন্তহীন কালো গভীর চোখই তাকে কৌতূহল প্রকাশ করতে নীরবে বাধা দিচ্ছে। ইঞ্জিন রুমের লালচে আলোয়

লোকটার চোখ দেখে মনে হয়েছে বলবেয়ারিঙের চেয়ে কম শক্ত না এই নতুন অয়েলার।

সিগারেটের গোড়াটা সাগরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার। 'আঙ্গ, যা বলছিলাম, ল্যাডি, এটাই এস এস ব্ল্যাকবার্নের শেষ যাত্রা। ইস্তাম্বুলে পাট তুলব আমরা, তারপর ক্লাইডসাইডে পৌঁছে দেব। ওখানেই তৈরি করা হয়েছে এস এস ব্ল্যাকবার্নকে। এখন ওখানেই হবে এর কবর। বুড়ো জাহাজের মৃত্যু। মৃত্যু সবসময়ই করুণ, তা-ই না, হলব্রিজ?'

জোসেফ হলব্রিজও তার সিগারেট সাগরে ছুঁড়ে ফেলল। 'হর্নে পৌঁছুতে আর কতো দেরি আমাদের?' নতুন অয়েলারের কথায় কোনও বিশেষ টান নেই। বোঝার উপায় নেই সে কোথাকার মানুষ। এটাও সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ারকে কৌতূহলী করে তুলেছে।

ডেক-হাউসিঙের একটা পোর্ট থেকে বের হওয়া গোল হলদে আলোতে দাঁড়াল সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার। পকেট থেকে সোনার ঘড়ি বের করে দেখল। 'আর দু'তিন ঘণ্টা, বড়জোর।'

নতুন অয়েলারের গ্রিজ মাখা চেহারাটা দেখল সেকেন্ড। স্বল্প আলোয় সুদর্শন মুখটা দেখে মনের ভিতর কী চলছে বুঝবার কোনও উপায় নেই। 'তুমি কি ভাবছ তীরে পৌঁছে ছুটি নেবে ঘোরাফেরার জন্যে? এই ট্রিপে তার কোনও উপায় নেই। জাহাজটা পৌঁছে দিয়েই অন্য ডিউটিতে জয়েন করতে হবে আমাদের।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল অয়েলার। 'না, তীরে নামার জন্য ছুটি নেব ভাবছি না। এমনি জেনে নিলাম কখন পৌঁছুব।'

'এখন তো জানো কখন পৌঁছুবে। সিগারেট শেষ, এবার চলো ইঞ্জিন রুমে ফিরে যাওয়া যাক, ল্যাডি।' বড় করে শ্বাস নিল ইঞ্জিনিয়ার, সাগরের দু'ধারের অস্পষ্ট বাতিগুলো দেখল। শীঘ্রি সী অভ মারমারা পার হয়ে বসফরাসে ঢুকবে এস এস ব্ল্যাকবার্ন।

'সত্যিই দুঃখজনক। একটা রাতও ছুটি কাটাতে পারব না আমরা,' আবার বলল সেকেন্ড। এবার তার গলায় আফসোস। 'ইস্তাম্বুল বন্দর হিসেবে ভালো। ওখানে পুরুষ মানুষের সব ধরনের চাহিদা মেটানোর বন্দোবস্ত আছে।'

ভোরের ঠিক একঘণ্টা আগে আবার ডেকে উঠে এলো নতুন অয়েলার। প্রাচীন জাহাজটায় কর্মতৎপরতা এখন নেই বললেই চলে। ইঞ্জিনগুলো অর্ধেক গতিতে চলছে, ঠেলে নিয়ে চলেছে মন্থর, অনিচ্ছুক ব্ল্যাকবার্নকে। এখন শুধু প্লেটগুলোর ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ অয়েলারকে মনে করিয়ে দিচ্ছে কোথায় আছে সে। সিরাগলিও পয়েন্টের কাছে চলে এসেছে জাহাজ। সামনেই গোল্ডেন হর্ন।

রেইলিঙের উপর দিয়ে কালো সাগরের দিকে তাকাল নতুন অয়েলার, মনে মনে বলল, অসম্ভব ঠাণ্ডা হবে এখন বসফরাসের পানি।

ভূতের মতো নিঃশব্দে স্টার্নের কাছে চলে গেল অয়েলার। তার হাতে রুপোলি কী যেন চকচক করছে। কয়েক পোঁচে আট নম্বর লাইফবোট ঢেকে রাখা তারপুলিনের রশিগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তেরপল সরিয়ে লাইফবোটের তলায় রাখা ছোট একটা সুটকেস তুলে নিল অয়েলার। তার আগেই বাহুর খাপে চলে গেছে ছোরাটা। এবার লাইফবোটটা আবার তেরপল দিয়ে ঢেকে দিয়ে ট্যাফরেইল পার হয়ে স্টারবোর্ড সাইডে চলে এলো সে। চার নম্বর লাইফবোটের আড়ালে বসল অপেক্ষায়, জানে, সময় হয়ে গেছে; আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না তাকে।

আগেও বহুবার ইস্তাম্বুল এসেছে সে কাজে। তবে তার এবারের কাজটা একটু অন্য ধরনের। এবার তাকে গোপনে চোরের মতো ঢুকতে হচ্ছে তুরস্কে। ঢুকতে হচ্ছে প্রায় কোনও পরিকল্পনা

ছাড়াই, অনেকটা অন্ধের মত।

ছায়ায় মিশে আরেকটা ছায়া হয়ে বসে আছে সে। তার চোখ পরিচিত বন্দরের দিকটা খুঁজছে। দেখা যাচ্ছে না, তবে তীরের দিকে আন্দাজ করা যায় জাহাজগুলোর অবস্থান; ডক, ডেরিক আর ক্রেনগুলো কোথায় আছে। ওগুলো ছাড়িয়ে ওয়্যারহাউস আর পায়ার। শহরের দিক থেকে টিলার দিকে উঠে গেছে জমিন, সেখানে ডজনখানেক মসজিদ আর মন্দির-গির্জা আছে। একটু পরেই ফজরের আযান দেবে।

ইস্তাম্বুল। পুরোনো কনস্ট্যান্টিনোপল। ইতিহাসের হাজারো ঘটনার সাক্ষী। বারবার পরিবর্তিত হয়েছে শহরটা বিভিন্ন শাসকের অধীনে। ইউরোপ আর এশিয়া–দুই মহাদেশ ছোঁয়া শহরটিতে চালু প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জগাখিচুড়ি মিশ্র সংস্কৃতি। নড়েচড়ে বসল অয়েলার। এবার ইস্তাম্বুলে যে-কোন সময়ে হানা দিতে পারে মৃত্যু। তাকে সতর্ক থাকতে হবে সর্বক্ষণ।

স্টারবোর্ডের দিকে তাকাল অয়েলার। হর্নের তেলতেলে পানির ওপারে আছে বেয়োগলু। ক্ষণিকের জন্য চেহারা থেকে কঠোরতা বিদায় নিল অয়েলারের। মেয়েটা ছিল রাশিয়ান। জিলিয়ান নাম ছিল ওর। আরও অনেকের মতোই কাছে এসেও দূরে সরে গেছে জিলিয়ান। ঘড়ি দেখল অয়েলার। কুয়াশার মধ্য দিয়ে সামনে দেখতে চেষ্টা করল। মেরিটাইম স্টেশন আর মুসরেটিয়ে মসজিদের মাঝখানের কোথাও থেকে তাকে সঙ্কেত দেওয়ার কথা। যদি অবশ্য ইতিমধ্যেই কোনও গণ্ডগোল না হয়ে থাকে। যদি। যদি কথাটার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

ওই যে! উজ্জ্বল একটা খুদে হলদে আলো কুয়াশা চিরে দিয়ে হারিয়ে গেল। তারপর জ্বলতে-নিভতে শুরু করল। রানা এজেন্সি! রানা এজেন্সি!

পকেট থেকে একটা পেন ফ্ল্যাশলাইট বের করে কুয়াশাচ্ছন্ন হর্নের দিকে পাল্টা সঙ্কেত দিল অয়েলার। রানা এজেন্সি! রানা এজেন্সি!

আবার সঙ্কেত পাঠানো হলো। রানা এজেন্সি!

উঠে দাঁড়াল অয়েলার। ছোট সুটকেস হাতে রেইলিং টপকে ঝাঁপ দিল সাগরে। ঝুপ করে একটা আওয়াজ হলো, আওয়াজটা চাপা পড়ে গেল জাহাজের গায়ে ঢেউয়ের বাড়ি খাওয়ার ছলাৎ শব্দে।

গোল্ডেন হর্নের পানিতে সোনালি কিছু নেই। ভয়ানক শীতল জল। তেল, বন্দরের জঞ্জাল আর ময়লা মিশে পানি ভয়ানক নোংরা আর কালচে হয়ে গেছে। পানিতে মাথা তুলল অয়েলার, তারপর সাঁতরে সরে যেতে শুরু করল এস এস ব্ল্যাকবার্নের কাছ থেকে।

একশো গজ সরে স্থির হলো সে। এস এস ব্ল্যাকবার্ন আগের মতোই ধীর গতিতে গ্যালাটা ব্রিজের দিকে চলেছে। ওটার স্টার্নের আলো কুয়াশায় বাধা পেয়ে ঝাপসা দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে মাথার উপর পেনফ্ল্যাশ তুলে সঙ্কেত দিচ্ছে অয়েলার।

পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল, তারপর বৈঠা বাওয়ার মৃদু আওয়াজটা কানে এলো তার। আবার সঙ্কেত দিল সে। জবাব দেওয়া হলো খানিকটা দূর থেকে। তারপর পানির উপর দিয়ে কুয়াশা চিরে ভেসে এলো কাঁপা-কাঁপা একটা কণ্ঠস্বর। 'মিস্টার রানা? সার?'

গলাটা চিনতে পারল অয়েলার। সিকান্দার মোস্তাক, ওরফে চিকা মোস্তাক। 'এখানে, মোস্তাক,' পরিষ্কার বাংলায় সাড়া দিল অয়েলার। 'থকথকে সুপে ভাসছি। শীতও মারাত্মক।'

ফ্যাকাসে একটা চেহারা দেখতে পেল অয়েলার কাছেই। হর্ন রিম চশমার কারণে তাকে দেখতে অনেকটা পেঁচার মতো লাগে।

তবে আচরণের কারণে তার ডাকনাম হয়েছে চিকা।

'মিস্টার রানা,' চিকা মোস্তাক বলে উঠল, 'আসছি! নৌকাটা সুবিধের নয় বলেই দেরি হলো।'

মাসুদ রানার পাশে এসে থামল ছোট্ট ডিঙি নৌকা। ওটার কিনারা ধরে উঠল রানা। 'আস্তে, সার!' প্রায় ককিয়ে উঠল চিকা মোস্তাক। 'বেশি নাড়ালে ডুবে যাবে।' পাটাতনে রাখা রানার ভেজা সুটকেসটা দেখল সে। ওটা থেকে পানি ঝরছে। 'ভেতরে জিনিস ঠিক আছে তো?'

'আছে। পুরোপুরি ওয়াটার প্রুফ।' প্যান্ট চিপে পানি ঝরাল রানা। চিকা মোস্তাকের সঙ্গে একজন টার্কিশকে দেখে ভালো লাগছে না ওর। 'ইনি কে?' তুর্কিতেই জিজ্ঞেস করল। ও ভেবেছিল চিকা মোস্তাক একা আসবে।

মোটাসোটা লোকটার পরনে রেইনকোট, মাথায় স্ন্যাপব্রিম হ্যাট। বৈঠা বাইছে সে। নিজেই জবাব দিল। 'আমি জায়েদ বোস্তামি। টার্কি নার্কোটিকস ডিপার্টমেন্ট।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল রানা।

চিকা মোস্তাক বলল, 'অসুবিধে নেই, মিস্টার রানা। একা আমি নৌকাটা চালাতে পারছিলাম না, ওকে ডেকে নিয়ে এসেছি।' মৃদু হাসল চিকা মোস্তাক। 'বৈঠা ও-ই বাইছে। তা ছাড়া, নৌকাটাও ও-ই চুরি করেছে।'

'বুঝতে পারছি কোথা থেকে চুরিটা করেছে,' বলল রানা। 'মাছ ধরার ডিঙি।'

আবার হাসল চিকা মোস্তাক। তাকে বেশ নার্ভাস মনে হলো। 'জেলেরা নৌকা পরিষ্কার করে না কখনও।' বোস্তামির দিকে তাকাল সে। 'চলো, সরে পড়া যাক হার্বার প্যাট্রলের চোখে পড়ার আগে। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই।'

বৈঠা বাইতে শুরু করল জায়েদ বোস্তামি। পায়ের কাছে সুটকেসটা রেখে স্টার্নের ধারে বসল রানা। ওর মুখোমুখি বসেছে চিকা মোস্তাক। ছোটখাটো লোকটা বদলায়নি তেমন, ভাবল রানা। বরাবরের মতোই কথা বলতে ভালোবাসে। ভিড়ে মিশে যেতে পারে চোখের নিমেষে। অত্যন্ত দক্ষ এবং মূল্যবান একজন এজেন্ট। ক্ষুরধার বুদ্ধি। ফিটনেস কোর্স কখনোই পাশ করতে পারত না সে, কিন্তু তার অন্যান্য যোগ্যতার কারণে ইস্তাম্বুলে রানা এজেন্সির চিফ হতে পেরেছে।

চিকা মোস্তাক নিচু গলায় বলল, 'আপনি এসেছেন বলে ভালো লাগছে, মিস্টার রানা। বুঝতে পারছি ব্যাপারটাকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন। নেয়া উচিতও। যাদের বিরুদ্ধে আমরা কাজ করছি, তাদের থামাতে হলে দক্ষ মানুষের দরকার।'

চাকরিতে ঢুকবার পর থেকেই রানাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে চিকা মোস্তাক। শ্রদ্ধা আরও বেড়েছে পরবর্তীতে নানান ঘটনায়। বারবার সে দেখেছে রানা কখনও ভুল সিদ্ধান্ত নেয় না। প্রয়োজনে কঠোর হতে জানে। আগে দেখে অধীনস্থদের নিরাপত্তা। স্বয়ংসম্পূর্ণ একজন পুরুষ। একসময় অজান্তেই মৃদুভাষী রানাকে ভালবেসে ফেলেছে সে, যদিও মুখে স্বীকার করবে না, তবে বয়সে ছোট রানার অন্ধভক্তে পরিণত হয়েছে সে। অসম্ভব উঁচু ধারণা পোষণ করে সে কোমলে কঠোরে মেশানো ব্যক্তিত্ববান এই যুবকের প্রতি। এতোটাই পছন্দ করে যে, তার জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতেও বাধবে না মোস্তাকের।

নীরবে বসে থাকল রানা। এখন পর্যন্ত সবকিছু পরিকল্পনা মাফিকই এগোচ্ছে। টার্কিশ পুলিশ জানে না ও এসেছে। ড্রাগ কার্টেলেরও কারও জানার কথা নয়। টার্কিশ নার্কোটিকসের জায়েদ বোস্তামি অবশ্য জানে। চিকা মোস্তাক বলতে পারবে কেন তাকে

নিয়ে এসেছে। নিশ্চয়ই লোকটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে সে। রানা মনে গেঁথে নিল, পরে জেনে নিতে হবে লোকটাকে বিশ্বাস করবার কারণটা।

'কাজ কিছু এগোল?' রানা জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়ল চিকা মোস্তাক। 'না, সার। তবে আমাদের ইনফর্মার মেয়েটা ড্রাগ কার্টেলের হাত ফস্কে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। আরেকটু হলেই ধরা পড়ে যেত। মেয়েটা নিজেও অ্যাডিক্ট ছিল, এখন সেরে উঠেছে। অসম্ভব ঘৃণা করে ও ড্রাগ কার্টেলকে। পরে হয়তো তাকে কাজে লাগানো যাবে। তবে আমরা যদি ওকে নিরাপত্তা না দিই তা হলে ওকে মৃতই ধরে নেয়া চলে। কার্টেল জেনে গেছে আমাদের ও ইনফর্মেশন দিত। কারও কারণে ছোটখাটো চুনোপুটি ধরা পড়লেও তাকে ছাড়ে না কার্টেল। আমার রিপোর্টে সবই জানতে পারবেন।'

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, জায়েদ বোস্তামিকে বৈঠা বাওয়া বন্ধ করে কান পাততে দেখে চুপ করে গেল। মাথা একদিকে কাত করে কী যেন শুনবার চেষ্টা করছে জায়েদ বোস্তামি। ভোর হচ্ছে আস্তে আস্তে, কুয়াশার পর্দা পাতলা হয়ে আসছে। অবশ্য জায়গায় জায়গায় কুয়াশা এখনও থোকা বেঁধে আছে। হোলস্টার থেকে একটা .৪৫ কোল্ট বের করে পাশে পাটাতনে নামিয়ে রাখল বোস্তামি।

চিকা মোস্তাক বলল, 'অস্থির হয়ে আছে বোস্তামি। সারারাত নানান শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ওর ধারণা কেউ আমাদের অনুসরণ করছে।'

হাত তুলে মোস্তাককে চুপ করতে বলল রানা। আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, মিস্টার বোস্তামি?'

কাঁধ ঝাঁকাল জায়েদ বোস্তামি। 'আমার কান যদি ভুল শুনে না

থাকে তা হলে পিছু নেয়া হয়েছে আমাদের। মাঝে মাঝেই একটা মোটরের আওয়াজ শুনেছি। একটু চলেই বন্ধ হয়ে যায়। রাতের আঁধারে আমাদের নিশ্চয়ই দেখতে পায়নি, তবে ভোর হলেই দেখতে পাবে।...আপনি কিছু শুনেছেন?'

'না।'

'খুব সতর্ক ওরা,' বলল বোস্তামি। 'তবে শপথ করে বলতে পারি আমি মোটরের আওয়াজ শুনেছি।'

'হার্বার প্যাট্রল হতে পারে,' বলল চিকা মোস্তাক। 'তাদের চোখে পড়াটাও আমাদের জন্যে ভালো হবে না। একশো একটা প্রশ্ন করবে তারা ধরে নিয়ে গিয়ে।'

'এগোতে থাকুন,' বোস্তামিকে বলল রানা। 'তীর আর কতোদূর?'

'একটা জেটিতে থামব আমরা,' বলল জায়েদ বোস্তামি। 'আর বড়জোর তিন-চার শো গজ। স্রোত আমাদের বাইরের দিকে ঠেলে নিতে চাইছে।'

'তা হলে সাবধানে নিঃশব্দে বৈঠা চালান।' সুটকেসটা খুলল রানা, গোপন কম্পার্টমেন্ট থেকে কাগজী লেবু আকৃতির একটা জিনিস বের করে হাতে নিল। টিএনটি-২৫ নাম দিয়েছেন ওটার শামশের আলী। এখনও ভালো মতো পরীক্ষা করে দেখা হয়নি জিনিসটা। তবে শামশের আলী সাবধান করে দিয়েছেন, পারতপক্ষে বোমাটা ব্যবহার করা উচিত হবে না।

সবুজ লেবুটার দিকে তাকিয়ে কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল চিকা মোস্তাক। বুক পকেটে ওটা রাখল রানা, সুটকেস বন্ধ করে অপেক্ষায় থাকল। শোল্ডার হোলস্টারে ওয়ালথার পিপিকে আছে ওর, বাহুর খাপে আছে স্টিলেটো, আর অণ্ডকোষের পাশে এক চিলতে টেপ থেকে ঝুলছে নকল অণ্ডকোষ; হাত দিলে আসল

জিনিস বলে মনে করবে লোকে। মার্বেল সাইজের দুটো সায়ানাইড গ্যাস বোমা রয়েছে ওই পাউচে। কিন্তু এখন বিপদ ঘটলে এগুলোর কোনটাই তেমন একটা কাজে আসবে না ওর। কাজে আসবে না জায়েদ বোস্তামির কোল্টও। তবে লেবুটা হয়তো পরিস্থিতি পাল্টে দিতে পারবে, যদি শামশের আলীর কথা মতো কাজ হয়, তা হলেই।

জেটির কাছে থোকা থোকা কুয়াশার ভিতর অপেক্ষা করছিল বিরাট ওয়েন্স ক্রুযারটা, যেন আক্রমণোদ্যত শিকারী বিড়াল অসহায় ইঁদুর ধরবে। নৌকাটাকে দেখেই গর্জে উঠল ক্রুযারের শক্তিশালী ইঞ্জিন। কুয়াশা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে এবার বেরিয়ে আসছে ওটা নৌকা লক্ষ্য করে। সরাসরি আসছে, নৌকার উপর চড়ে বসবে।

বিড়বিড় করে গাল বকল জায়েদ বোস্তামি, তারপর বৈঠা নামিয়ে রেখে পাটাতন থেকে রিভলভারটা তুলে নিল। চিকা মোস্তাককে দেখে মনে হলো মুহূর্তের জন্য আতঙ্কে জমে গেছে সে।

এক সেকেন্ডের মধ্যেই পরিস্থিতি বুঝে নিল রানা, ফ্লাইং ব্রিজের গানার ওর মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। একাকী দাঁড়িয়ে আছে সে, হাতে একটা সাবমেশিনগান। ওটার নল রেইলিঙের উপর রেখে ছোট্ট নৌকার তিন আরোহীর দিকে লক্ষ্যস্থির করছে সে। গোটা ব্যাপারটা সুচিন্তিত এবং পরিকল্পিত, হঠাৎ আক্রমণ শানানো হয়নি। জেনে-বুঝে খুন করতেই আসছে আততায়ী।

'পানিতে নামুন!' নিচু গলায় নির্দেশ দিল রানা। 'জলদি! গভীরে ডুব দেবেন!' সুটকেসটা এক লাথিতে চিকার সামনে পৌঁছে দিল ও। 'মোস্তাক, সুটকেস সামলান। মিস্টার বোস্তামি...'

বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়িয়েছে জায়েদ বোস্তামি, দু'হাতে কালো কোল্টটা ধরে লক্ষ্যস্থির করছে। ভোরের বাতাসে

ওটার গর্জন ফাঁপা শোনাল। পিছনের ধূসরতায় সাবমেশিন-গানারকে কালচে একটা অবয়ব মনে হচ্ছে। সাবধানে লক্ষ্য ঠিক করে এক পশলা গুলি করল সে।

'গাধা!' লাথি মেরে নার্কোটিকসের লোকটাকে নৌকা থেকে ফেলে দিতে চেষ্টা করল রানা। হলো না। সরে যাওয়ায় ওর আওতার বাইরেই রয়ে গেল সে। চিকা মোস্তাক সুটকেস হাতে আস্তে করে পিছলে নেমে গেল নৌকা থেকে।

রানার চারদিকে বুলেট বৃষ্টির ফলে নৌকার কাঠের কুচি উড়ছে। এক হাঁটু গেড়ে বসেছে বোস্তামি, নাক-মুখ কুঁচকে গুলি করে চলেছে। ক্রুযারটা দ্রুত এগিয়ে আসছে। আরেক পশলা গুলি বের হলো সাবমেশিনগান থেকে। মাথা নিচু করে পাটাতনে শুয়ে পড়ল রানা, নইলে ওর শরীরটা দু'টুকরো হয়ে যেত। ওর মাথার উপর দিয়ে শিস তুলে ছুটে যাচ্ছে দ্রুতগতির বুলেট। রানা স্পষ্ট দেখতে পেল, সাবমেশিনগানের বুলেট ছোট ছোট লাল গর্ত তৈরি করছে জায়েদ বোস্তামির ভারী দেহে। এখনও গুলি করছে লোকটা, তবে রিভলভারটার নল নেমে আসছে ক্রমেই। হাতে আর জোর পাচ্ছে না। পাওয়ার কথাও নয়।

শেষবারের মতো গুলি করতে চেষ্টা করল বোস্তামি। রিভলভার তাক করতে চাইল। তার আগেই আবার গুলি করেছে সাবমেশিনগানার। পাঁচতলা থেকে পড়া তরমুজের মতো ফেটে চৌচির হয়ে গেল জায়েদ বোস্তামির মাথা।

নৌকা চিরে দিতে এগিয়ে আসছে ক্রুযার। এক ধার দিয়ে নৌকা থেকে নেমে পড়ল রানা। একই সঙ্গে বুক পকেট থেকে সবুজ লেবু বের করে ফেলেছে ও, এক মাথার গোল নবটা ঘুরিয়েই ওটা ছুঁড়ে দিল ও ওয়েন্স ক্রুযারের আফটার ককপিট লক্ষ্য করে।

লেবুটা ঠিক জায়গায় পড়েছে দেখেই গভীরে ডুব দিল রানা।

আরও গভীরে চলে যাচ্ছে ও যতো দ্রুত সম্ভব। মনে মনে আশা করল চিকা মোস্তাকও তা-ই করবে। আর পাঁচ সেকেন্ড পর বিস্ফোরণ। টিএনটি-২৫-এর এই প্রথম ফিল্ড টেস্ট হচ্ছে। আরও গভীরে নামতে নামতে রানার মাথায় একটা চিন্তাই দোলা দিল: টিএনটি-২৫ কেমন কাজ দেয় সেটা আমি রিপোর্ট করতে পারব তো?

কানে প্রথমে কিছুই শুনতে পেল না রানা, তবে চাপটা অনুভব করল। তারপর শুনতে পেল ভোঁতা গর্জন। যেন দৈত্যের একটা হাত নেমে এসেছে গোল্ডেন হর্নের ময়লা, তেলতেলে ঘোলাটে পানির ভিতর, নাড়ছে-চাড়ছে পানি উন্মত্তের মতো। পলকা একটা পুতুলের মতো ছিটকে গেল রানা। বসফরাসের তলদেশের কাদায় নাক গেঁথে গেল ওর। তারপর হঠাৎ করেই যেন দানবীয় হাতটা ওকে খুঁজে পেল। এক টানে তুলে ফেলল ওকে কাদার ভিতর থেকে, তারপর ছুঁড়ে দিল পানির উপর।

ভেসে থাকতে চেষ্টা করল রানা, বিবশ লাগছে ওর। মাথাটা যেন ব্যথায় ছিঁড়ে পড়বে। কানের ভিতর দামামা বাজাচ্ছে কেউ মহা উল্লাসে। চোখে স্পষ্ট দেখতে পেল না ও।

একগাদা জঞ্জালের ভিতর ভাসছে রানা। আস্তে আস্তে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ছে ওয়েন্স ক্রুযারের ধ্বংসাবশেষ। একটা দেহের অংশবিশেষ ওকে পাশ কাটাল। মাথা নেই ওটার, তবে মোটা উরু দেখে বোঝা গেল চিকা মোস্তাক নয়।

চারপাশে তাকাল রানা। চিকা মোস্তাকের কোনও চিহ্ন নেই কোথাও। বুঝতে পারল, বেশিক্ষণ এখানে খুঁজতে পারবে না ও, সরে যেতে হবে এখান থেকে। চিকা মোস্তাক যদি মারা গিয়ে থাকে তা হলে ওকে এমন অনেক সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে যেগুলো স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে করতে হতো না। এমনকী নতুন আস্তানা

মোস্তাক কোথায় করেছে তা-ও ওর জানা নেই। অথচ জানা থাকা দরকার ছিল। মেয়েটাকে ওর দরকার পড়তে পারে। জেটির দিকে সাঁতরাতে শুরু করল রানা।

'মিস্টার রানা! বাঁচান!' দুর্বল একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ওর কানে।

ঝট করে ঘুরল রানা। ওর চোখ চিকা মোস্তাককে খুঁজছে। গলাটা তারই, কিন্তু কোথায় সে? মূল্যবান সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কারও নজরে পড়বার আগেই সরে পড়তে হবে এখান থেকে। যে-কোনও সময়ে লাল টকটকে সূর্যটা পুবাকাশে মুখ তুলবে। তার আগেই হয়তো হাজির হয়ে যাবে হার্বার প্যাট্রল।

'মিস্টার রানা! এদিকে!' কুয়াশার ভিতর থেকে আসছে আওয়াজটা।

'কথা বলতে থাকুন,' পাল্টা চেঁচাল রানা। 'আমি আসছি।'

'আমারররর সোনারররর বাংলাআআআআ আমিইইই তোমায় ভালোবাসিইহিহিহিহিহি!' বেসুরো গলায় গান ধরল মোস্তাক শীতে কাঁপতে কাঁপতে।

অবশেষে কুয়াশার ভিতর দিয়ে সাঁতরে মোস্তাককে তিরিশ ফুট দূরে খুঁজে পেল রানা, খুদে লোকটা এখনও দু'হাতে সুটকেসটা ধরে আছে। এক হাতে চিকা মোস্তাকের ঘাড় পেঁচিয়ে ধরল ও, তারপর দ্রুত সাঁতরাতে শুরু করল জেটি লক্ষ্য করে।

ছড়ে গেছে চিকা মোস্তাকের হাত-পা, কাতর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে মারা যাবে যে-কোনও সময়, তারপরও রানার কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করল, 'কী ফাটালেন, বস্? অ্যাটম বোমা নয় তো?'

'বালুর কণার সমান একটা বিস্ফোরক ছিল ওটার ভেতর,' বলল রানা। 'টিএনটি-২৫ নাম ওটার। সাবধান মোস্তাক,

সুটকেসটা ছেড়ে দেবেন না। সুটকেসে ওই জিনিস আরও বেশ কয়েকটা আছে।' এক হাতে পানি কেটে এগোচ্ছে ও।

চিকা মোস্তাক বলল, 'শুরুটা বেশ দেখার মতোই হলো, সার। আরেকটু হলেই গিয়েছিলাম!'

দুই

ক্লান্তি বোধ করতে শুরু করেছে রানা, তবে পৌঁছে গেল নিচু, পাথুরে জেটির কাছে। সুটকেস সহ মোস্তাককে ঠেলে দিল ও। জেটির সিঁড়ির তামাটে ধাপগুলো শত শত বছরের আবহাওয়ার অত্যাচারে ক্ষয়ে এবড়োখেবড়ো, খসখসে হয়ে গেছে। ওগুলো বেয়ে উঠতেই সামনে পড়ল একটা সরু নির্জন রাস্তা। এতো ভোরে লোক বের হয়নি এখনও। তবে বিস্ফোরণের আওয়াজ শীঘ্রি লোক ডেকে আনবে।

মোস্তাকের কনুই ধরে সামনে বাড়ল রানা, সুটকেসটা নিয়ে নিয়েছে। 'গাড়িটা কোথায়, মোস্তাক?'

'কয়েক রাস্তা পরে একটা গলিতে। কালো একটা ওপেল। আমার নিজের গাড়ি, রানা এজেন্সিরগুলো সব পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।'

'তা হলে চলুন, পুলিশ আসার আগেই এখান থেকে সরে পড়া যাক।'

‘ইনশাল্লাহ্ পারব,’ বলল মোস্তাক। ‘আল্লাহ্ চাহেন তো।’

দ্রুত পা চালাল দু’জন। আট মিনিট পর গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল ওরা। পিছনের সিটে উঠে বসল মোস্তাক, এখনও হাঁপাচ্ছে ডাঙায় তোলা মাছের মতো। কোব্‌ল্‌ পাথরের সরু গলি থেকে বেরিয়ে বাঁক নিল রানা। ট্রাফিক আয়নায় দু’পাশে কোনও গাড়ি দেখা গেল না। তবে কয়েক সেকেন্ড আগে পুলিশের গাড়ির সাইরেন শুনেছে রানা। ‘এবার, মোস্তাক? কোনদিকে?’

‘বামে মোড় নিন, সার। উত্তরে যাব আমরা।’

মোড় নিল রানা। ‘হাইডআউটটা কোথায়?’

‘শহরের পুরোনো অংশে। আতাতুর্ক বুলেভার্ড পার হতে হবে। তারপর পড়বে মিলেট ক্যাডেসি। ওটা পেরিয়ে শহরের পুরোনো দেয়ালের কাছে জায়গাটা। গরীবদের পল্লী। খুনোখুনি লেগেই আছে।’

‘জানি,’ বলল রানা। ‘এক রাতে আমাকে ওখানে খুন করতে নিয়েছিল চারজন ছিনতাইকারী।’

প্রশ্নটা আপনা থেকেই এলো রানার মনে। এসব ছোট ছোট ব্যাপার খেয়াল রাখতে পারাই এই পেশায় বেঁচে থাকার জন্য অনেক বড় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। হয়তো একটা লোক বিশেষ ব্র্যান্ডের সিগারেট খায়, কারও কান পিছন থেকে দেখতে অন্যরকম লাগে, কারও হয়তো কোনও মুদ্রাদোষ আছে–সবই খেয়ালে রাখতে হয়।

রানা জিজ্ঞেস করল, ‘ইস্তাম্বুলের পুরোনো অংশেই যদি থাকবেন তা হলে পোর্টের বদলে স্টারবোর্ড সাইড থেকে আমাকে পিক করলেন কেন? পোর্ট তো কাছে হতো। এই পথে আমাদের একটা ব্রিজ পার হতে হবে। সেটা বিপজ্জনকও হতে পারে। ওখানে জ্যাম থাকতে পারে। দু’পাশ থেকে আটকে ফেলাও

সহজ।'

'সত্যি বলতে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে চরম আতঙ্কের মধ্যে আছি আমি,' দায় স্বীকারের সুরে বলল মোস্তাক। 'বিশেষ করে নার্কোটিকসের শেষ লোকটা খুন হওয়ার পর থেকে। জায়েদ বোস্তামির কথা বলছি না। ওকে নিয়ে এ পর্যন্ত পাঁচজন হলো। ওর আগে গলা কেটে খুন করেছে ওর আপন ভাইকে। সেজন্যেই ওকে বিশ্বাস করে সঙ্গে নিয়ে যাই আমি আপনাকে আনতে। এখন আমার ভয়টা আরও বেড়েছে।'

'ভয় সবাই পায়,' বলল রানা। 'ভয় পাবার কারণ ঘটলে ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক, এবং উচিত। বলে যান, মোস্তাক। এদিকের পরিস্থিতি জানতে চাই আমি।'

'শুধু ভয়ই পাইনি আমি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মোস্তাক। 'যা বললাম, চরম আতঙ্কের মধ্যে আছি। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে কিছুদিন ধরে আমার। মনে হচ্ছে সময় শেষ হয়ে আসছে আমার। মন চাইছে সব ছেড়েছুড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে।'

রিয়ারভিউ মিররে মোস্তাককে দেখল রানা। আগেও অনেক এজেন্টকে এই সুরে কথা বলতে শুনেছে ও। হাল ছেড়ে দেওয়া পরাজিত এই অভিব্যক্তিটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই পর্যায়ে কাজে ভুল হতে থাকে। বেশিরভাগ সময়েই সেই ভুলের মাশুল গুনতে হয় জীবন দিয়ে। রানা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, মোস্তাকের একটা ব্যবস্থা করতে হবে ওকে। এমন কারও সঙ্গে কাজ করাটা ঠিক নয় যে ভাবছে তার দিন শেষ হয়ে এসেছে।

চিকা মোস্তাক বলে উঠল, 'বাধ্য হয়ে হাইডআউটে লুকাতে হয় আমাকে। সঙ্গে প্রায় কিছুই আনতে পারিনি। ফাইলগুলোও না। ওগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এজেন্সির অফিসে। যতোটুকু জানতাম তা আমি নতুন করে লিখেছি। তেমন কিছু না, তবে ওটা

আপনার কাজে আসবে। চিন্তা করবেন না, আমার হাইডআউট এখনও সেফ। জায়েদ বোস্তামি জানত না ওটা কোথায়। ইদানীং ওর ব্যাপারেও একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল আমার। ওকে বিশ্বাস করতে পারিনি, ব্যাপারটা তা নয়। আমার আসলে মনে হচ্ছিল ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে অসতর্ক হয়ে পড়ছিল লোকটা।'

লাল বাতি জ্বলে ওঠায় গাড়ি থামাল রানা। রিয়ারভিউ মিররে আবার চিকা মোস্তাককে দেখল। ওর চোখে চোখ পড়তেই চোখ সরিয়ে নিল মোস্তাক।

মুয়াযযিনরা আযান দিতে শুরু করেছেন। মাইকে ভেসে আসছে তাঁদের আহ্বান। রাস্তার বেশিরভাগ নিয়ন বাতিই নিভে গেছে। গাড়ি-ঘোড়া বের হতে শুরু করেছে। ট্রাম চলাচল করছে, আর আছে ডলমাস ক্যাব। পিঠে করে বোঝা বয়ে নিয়ে চলেছে গাধা। ট্রামে-বাসে উঠবার জন্য ইতিমধ্যেই লাইন ধরছে মানুষ।

বাতি সবুজ হয়ে গেল। অন্যান্য গাড়ির সঙ্গে স্বাভাবিক গতিতে এগোল রানা। পিছন থেকে চিকা মোস্তাক বলল, 'আমরা ওখানে আপনাকে পিক করেছি তার আরেকটা কারণ হচ্ছে হর্নের এদিকে নৌকা চুরির কোনও সুযোগ নেই। জেলেপাড়ায় যেতে হয়েছে সেজন্যে।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আরেকটা কারণ জায়েদ বোস্তামি জানত না ঠিক কোথায় হাইডআউট আছে আপনার। আপনি তাকে জানাতে চাননি। কাজেই ঘুরপথে এসেছি আমরা, ওকে হয়তো মাঝপথে কোথাও নামিয়ে দেয়ার কথা ছিল, তা-ই না? কেউ পিছু নিতে পারে আশঙ্কা করছিলেন। বারবার পিছনে তাকাচ্ছেন আপনি, মোস্তাক। আমার চোখে কেউ ধরা পড়েনি। আপনি কি কাউকে অনুসরণ করতে দেখেছেন?'

'না। মনে হয় সব ঠিকই আছে।'

চিকার গলায় স্বস্তির সুরটা চিনতে পারল রানা। একটু খারাপই লেগে উঠল ওর খুদে লোকটার জন্য। খুনোখুনি মোস্তাকের কাজের ধারা নয়, ওর কাজ বুদ্ধি খেলানো। নিজেকে রানা মনে করিয়ে দিল, এখন থেকে বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে চিকা মোস্তাকের উপর। কাজ শুরু করতে হবে সতর্কতার সঙ্গে। মিশনের শুরুটা মোটেই ভালো ভাবে হয়নি।

পুরোনো বাইজেন্টিয়ামের সোনালি ছাদের ওপার থেকে মুখ তুলেছে ভোরের টকটকে লাল সূর্য। কনস্ট্যান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুল, শহরটাকে যে নামেই ডাকা যাক না কেন, জায়গাটা চমৎকার, তবে বিপজ্জনক। শহরটা সেই সুন্দরী মহিলার মতো, যাকে কখনও বিশ্বাস করা যায় না।

ঘাড় ফেরাল রানা। 'আর কতোটা দূরে হাইডআউট? দিনের আলো ফুটে গেছে। পুলিশ ধরলে তাদের প্রশ্নের জবাব দেয়া কঠিন হবে। আমাদের মতো দুটো নোংরা ভিজে পোশাক পরা হতচ্ছাড়া এরকম একটা গাড়িতে কী করছি?'

'আর বেশি দূরে নয়,' জানাল মোস্তাক। 'ওখানে পৌঁছেই আপনাকে নিয়ে বসব আমি। সংক্ষিপ্ত রিপোর্টটা সেরে ফেলব।'

'তা হলে আপাতত মাথা থেকে চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিন। আপনাকে নার্ভাস দেখাচ্ছে।'

'সত্যিই আমি নার্ভাস,' বেসুরো হাসি হাসল চিকা মোস্তাক। 'ওভাবে বোস্তামিকে মরতে দেখার পর...সামনের বাঁকটা নিন। ভেটান রোড পেরিয়ে আবার ডানে, মিহরিম্যান মসজিদ পর্যন্ত। ওখানেই আমাদের নতুন হাইডআউট। মসজিদের এতো কাছে যে আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় ঠিক ওটার তলাতেই আছি আমরা।'

পাঁচ মিনিট একমনে গাড়ি চালাল রানা। তারপর মারমারা সাগর থেকে গোল্ডেন হর্ন পর্যন্ত বাঁকা চাঁদের মতো চলে যাওয়া দেয়াল দুটো শুরু হতেই মোস্তাকের কথায় আবার বাঁক নিল।

কাদা ভরা একটা গলি এটা। এখানে-ওখানে পথের উপর ছোট ছোট পুকুর তৈরি করেছে জমে থাকা পানি। দু'পাশে কাঠের ছোট ছোট বাড়ি। বাতাসে আবর্জনার দুর্গন্ধ। রাস্তার ধারে ময়লা তো ফেলেছেই, মলত্যাগও করেছে অনেকে। নীল মাছি ভিনভিন করছে ওসব ঘিরে।

গাড়িটা মোস্তাকের দেখানো একটা গ্যারেজে ঢুকিয়ে রাখল রানা, এরপর পায়ে হেঁটে এগোল ওরা। মিনিট দুয়েক হাঁটবার পর এক ধারে খোলা একটা মর্গ দেখতে পেল রানা। ছাদ আছে, তবে সামনের দেয়ালটা নেই, রাস্তা থেকে দেখা যায়।

'মর্গের ভিতর ঢুকতে হবে,' বলল চিকা মোস্তাক। 'গন্ধটা সহ্য করতে না পারলে শ্বাস আটকে রাখতে পারেন। গরীবদের মর্গ। কবর দেয়ার আগে পর্যন্ত লাশ এখানেই ফেলে রাখা হয়।'

কৌতূহলের সঙ্গে নারী-পুরুষের ছয়-সাতটা উলঙ্গ আধপচা লাশ দেখল রানা। লম্বা টেবিলে শুইয়ে রাখা হয়েছে ওগুলো। উপর থেকে টিপটিপ করে ঝরছে শীতল পানির ধারা। রানা লক্ষ করল, চিকা মোস্তাক একবারও টেবিলগুলোর দিকে না তাকিয়ে দ্রুত পায়ে পাশ কাটাচ্ছে। সত্যিই মোস্তাকের নার্ভের উপর মারাত্মক চাপ পড়ছে। রানা স্থির করল, মোস্তাককে ফেরত নিয়ে অন্য কাউকে এখানে পাঠাবে ও প্রথম সুযোগেই।

মর্গে কোনও অ্যাটেন্ডেন্ট নেই। জীবিত কেউই নেই আসলে। ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হওয়ায় কারণ জানতে চাইল রানা।

'আছে তারা,' বলল মোস্তাক। 'বকশিশ দিয়ে কিনে নিয়েছি ওদের। এখানে থাকতে মানা করে দিয়েছি। আসলে এখানে কেউ

এলো কী গেল তাতে তাদের কিছুই যায় আসে না। যতোক্ষণ উন্মাদ বিদেশিরা পয়সা ছাড়ছে ততোক্ষণ নাক গলাবে না কর্তৃপক্ষ।'

পুরোনো নোংরা টয়লেটে মোস্তাকের পিছু নিয়ে ঢুকল রানা। ওটার পিছনের দেয়ালে একটা মাত্র কোটহুক দেখা গেল। ওটা ধরে মোচড় দিল মোস্তাক। এক পাশে খানিকটা সরে গেল দেয়াল, ওপাশে নিরেট কালো অন্ধকার। ফাঁকটা সৃষ্টি হতেই নতুন একটা পীড়াদায়ক গন্ধ রানার অত্যাচারিত নাকে আঘাত করল।

'হাড্ডি,' পেন ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে বলল মোস্তাক। সরু একটা করিডর ধরে এগিয়ে চলেছে সে রানার আগে আগে। টর্চটা অন্ধকার দূর করতে পারছে না। সামান্য আলোতে এগোতে হলো। নিজের টর্চটাও জ্বালল রানা। ওর টর্চের আলো প্রথমেই গিয়ে পড়ল বিরাটাকৃতি একটা ইঁদুরের উপর। একটা তাকে বসে আছে ওটা। লাল চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে। ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই দৃষ্টিতে।

'হাড্ডি,' আবার বলল মোস্তাক। 'এখানে হাড় ছাড়া আর কিছু নেই, মিস্টার রানা। ক্যাটাকুম ছিল জায়গাটা। পুরোনো একটা চার্চের নীচে তৈরি করা হয়েছিল। নিশ্চয়ই জানেন, সে-সময় লাশ কবর দেয়া হতো না? বেযমেন্টে নামিয়ে গাদা করে রাখা হতো।'

অদ্ভুত একটা ব্যাপার খেয়াল করল রানা। এই মরা মানুষের হাড় আর ইঁদুরের রাজ্যে চিকা মোস্তাককে অনেক বেশি প্রাঞ্জল মনে হচ্ছে। সম্ভবত নিজেকে নিরাপদ ভাবছে সে এখানে।

'নামতে হবে আমাদের,' জানাল মোস্তাক।

'মেয়েটাকে এখানে নামিয়ে এনেছেন?'

'হ্যাঁ। ওকে দেখলে অবাক হবেন। মিলি নাম ওর। মিলি গঞ্জালেস। পুতুলের মতোই সুন্দর। দেখলে বোঝা যায় না অ্যাডিক্ট ছিল। আপনাকে তো ওর ব্যাপারে আগেই জানিয়েছি। খুব ভাল

একটা মেয়ে।...এখানেই দাঁড়ান, সার।'

টর্চটা নাড়ল মোস্তাক। আলোটা স্থির হলো মেঝেয় রাখা ছোট একটা করোটির স্তূপের উপর। তিনকোনা করে গম্বুজাকৃতিতে সাজানো হয়েছে করোটিগুলো। এরকম স্তূপ আরও অনেক আছে। সামনে ঝুঁকে নির্দিষ্ট স্তূপটায় কী যেন দেখল মোস্তাক। বিড়বিড় করে গাল বকে একটা করোটি তুলে নিল সে। ওটার দুই চোখের কোটরের মাঝখানে একটা লাল ক্রস চিহ্ন দেখতে পেল রানা।

'এটাই বুড়ো হেক্টর,' বলল মোস্তাক। 'চিহ্ন দিয়ে না রাখলে মুশকিলে পড়তে হতো।' উবু হয়ে মেঝের একটা তিন ফুট বাই তিন ফুট ট্র্যাপডোর সরাল সে। নীচে নেমে যাওয়া পাথুরে সরু, খাড়া সিঁড়ি দেখতে পেল রানা।

টর্চ দিয়ে ইঙ্গিত করল মোস্তাক। 'নেমে পড়ুন। দুশো ধাপ নামার পর পৌঁছে যাবেন আমাদের নতুন হাইডআউটে।'

নামল রানা। ওর পিছনে ট্র্যাপডোরটা আবার টেনে বসিয়ে দিল মোস্তাক, তারপর ওর পিছু নিল। রানা জিজ্ঞেস করল, 'এখানে মেয়েটাকে একা রেখে গেছেন?'

'না।' মৃদু হাসল মোস্তাক। 'ও ভয়েই মারা পড়ত। সালমান রাশেদির সঙ্গে ওকে রেখে গেছি।'

রাশেদি লোকটা বোবা, তবে কানে শুনতে পায়। পুরোপুরি বিশ্বস্ত। রানা এজেন্সির নাইটগার্ড ছিল, অল্পের জন্য কার্টেলের গানম্যানদের হাত থেকে বেঁচে যায়। রানাকে পয়গম্বরের মতো ভক্তি করে সে।

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নীরবে নামছে ওরা। রানা ঠিক করল যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকা মোস্তাকের রিপ্লেসমেন্ট আনাতে হবে। মানুষটার নার্ভের উপর থেকে চাপ কমাতে ট্রিটমেন্ট করানো হবে দক্ষ সাইকিয়াট্রিস্ট দিয়ে। তাতে দেখা যায় অনেক সময়ই খুব

সুফল পাওয়া যায়। নতুন করে দায়িত্ব পালনে যোগ্যতার পরিচয় দেয় এজেন্ট। ট্রিটমেন্টে কাজ না হলে ওকে অন্য কোথাও ডেস্ক জবে বসিয়ে দেওয়া যাবে। সেটা মোস্তাকের জন্য খারাপ হবে না।

মনের অসন্তোষ আর ক্ষোভ চেপে রাখল রানা। এই মিশনে শুরু থেকেই গণ্ডগোল বেধে গেছে। রীতিমত প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে ক্রুযার নিয়ে সাবমেশিনগানধারীর হামলা কীভাবে সম্ভব? ও আসছে সে-খবরটা লিক হলো কী করে? ইনফর্মার মেয়েটাকে বিশ্বাস করা যায়? কোনও কাজে আসবে মেয়েটা ওদের, মূল্যবান তথ্য যোগাতে পারবে, না বাড়তি একটা বোঝা হবে? হয়তো এখনও ড্রাগ নেয় সে। অথচ মোস্তাক তাকে রানা এজেন্সির এজেন্ট করে নিয়েছিল। মেয়েটা আসলে কী তা জানবার ব্যাপারে এখন ভীতচকিত চিকা মোস্তাকের উপর ভরসা করা যায় না। যদিও চিকা মোস্তাক মেয়েটা সম্বন্ধে সবই ওকে জানিয়েছে, তবুও নিশ্চিত হওয়ার উপায় কী? এক গাদা প্রশ্ন জাগছে মনে, অথচ কোনওটার জবাব জানা নেই ওর।

মেয়েটা ড্রাগ কার্টেলের চরও হতে পারে। মধ্যবিত্ত একটা ভাল পরিবারের এতিম সুন্দরী তরুণী মেয়ে, অ্যাডিক্ট; পরবর্তীতে রানা এজেন্সির ইনফর্মার আর এজেন্টের কাজ করেছে, বিপদে পড়ে চিকা মোস্তাকের অনুগ্রহ চাইল। মোস্তাক আশ্রয় দেবে না তাকে? মেয়েটাকে সোজা গোপন আস্তানায় এনে তুলেছে মোস্তাক। কাজটা কতোখানি ঠিক হয়েছে বলা মুশকিল।

মেয়েটা প্ল্যান্ট হতেই পারে, কিন্তু এখনই নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। যদি চর হয় তা হলে এই আস্তানাও এখন আর নিরাপদ নয়।

বড় করে শ্বাস নিল রানা। ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ল। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে ভাবল, আসলে মেয়েটা কী সেটা একটু পরেই জানা যাবে।

তিন

আধঘণ্টা হলো গোসল করে নাস্তা সেরে চিকা মোস্তাককে নিয়ে বসেছে রানা। এরই মধ্যে জেনে নিয়েছে, এখানে নিয়ে আসবার পর মিলি মেয়েটা একবারও বের হয়নি। কাজেই সে কার্টেলকে কোনও তথ্য দেবে তার উপায় ছিল না। পথে ওদের অনুসরণ করা হয়নি, অন্তত ওর চোখে পড়েনি, অনুসরণ করা হলে এতোক্ষণে এখানে হামলা হয়ে যেত। আপাতত জায়গাটা নিরাপদ।

তবু অস্বস্তি বোধ করছে রানা। শুরুতেই ওর উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যাওয়াটা গোটা অ্যাসাইনমেন্টের উপর খারাপ একটা প্রভাব ফেলবে। বোঝাই যাচ্ছে সতর্ক হয়ে উঠেছে ড্রাগ লর্ডরা। তাদের নাগালে পাওয়া বা তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়বে শতগুণ। ওকে স্বীকার করতে হলো, মোস্তাকের রিপোর্ট পেয়ে মাথা গরম করে একা ছুটে এসে বোধহয় ভাল কাজ করেনি ও। এখনও কোনও পরিকল্পনা তৈরি হয়নি ওর মাথায়। জেদের বশে ছুটে এসেছে ও, কী করবে ঠিক করতে পারেনি কিছুই।

চিকা মোস্তাক রানার পাশে বসে বলল, 'যতো শীঘ্রি সম্ভব আমাকে ফেরত নিয়ে নতুন কাউকে পাঠালে জানে বাঁচি আমি।'

'ব্যবস্থা করা হবে,' বলল রানা। 'তবে তার আগে আপনাকে

আমার দরকার। আজ রাতেই সিনেমা ব্লিউতে যাচ্ছি আমরা। আপনার কথা যদি ঠিক হয় তা হলে ওখান থেকেই কাজ শুরু করব আমরা।'

'যা বলেছি জেনে বলেছি আমি, সার,' জোর দিয়ে বলল মোস্তাক।

'সার বলবেন না আমাকে, অস্বস্তি লাগে,' বলল চিন্তিত রানা।

'বয়সে আমি বড় হওয়ায় ভাইও তো বলতে পারি না,' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মোস্তাক। 'বস্ বললে চলবে?'

জবাব না দিয়ে চিকা মোস্তাকের দেওয়া ফাইলটার কথা ভাবল রানা। ওগুলো সংক্ষিপ্ত কয়েকটা অসমাপ্ত রিপোর্ট মাত্র, মোস্তাক স্মৃতি হাতড়ে তৈরি করেছে। ফাইলটায় ড্রাগ লর্ডদের মোটামুটি পরিচিতি ছাড়া আর কিছু নেই। আসল রিপোর্টগুলো রানা এজেন্সির অফিসের সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ফাইলটা নিয়ে বসল ও। মোস্তাক পাশে বসে সালমান রাশেদির সঙ্গে চেয়ে আছে ওর দিকে।

ডিবার্গ ম্যাকেঞ্জি। বয়স ষাটের কাছাকাছি। মোটাসোটা মানুষ। হৃৎপিণ্ডের সমস্যায় ভুগছে। ফ্রান্সের নাগরিক ছিল, এখন তুরস্কের। ফ্রান্সে তার বিরুদ্ধে কোনও বেআইনী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ নেই। তুরস্কেও তার বিরুদ্ধে কোনও কেস নেই। গুজব আছে সে ড্রাগ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। অনেকদিন থেকেই তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে, কিন্তু কখনও কিছু প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। ম্যাকেঞ্জি এক্সপোর্টিং কোম্পানি লিমিটেডের এমডি সে। ডিভান অ্যানেক্সের টপ ফ্লোরে তার অফিস। একই ফ্লোরে একটা পেন্টহাউস সুইটে থাকে সে। পুরো ফ্লোরই তার ভাড়া করা। অসংখ্য গার্ড পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে পছন্দ করে। অবিবাহিত। যৌন বিষয়ে মোটেই আগ্রহী নয় বলে জানা যায়। হয়তো বয়স

তার কারণ। তামাক আর কম্বল রপ্তানী করে। সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। পদমর্যাদা ব্যবস্থাপক বা এধরনের কিছু। প্রচুর ছবি পাওয়া যায়। তার অফিস এবং সুইটে আড়িপাতার সবধরনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

'এটাই বড় একটা সমস্যা,' রানা মুখ তোলায় বলল চিকা মোস্তাক। 'এদের দক্ষ একটা কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স আছে। যতো ভাবেই আমরা চেষ্টা করি না কেন, ছারপোকা যতোই বসাই, কোনও কাজ হয় না। ওগুলো খুঁজে নিয়ে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়। শুরু থেকে আমাদের আড়ি পাতার সব ধরনের চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। ডিবার্গ ম্যাকেঞ্জিকে প্রথম সন্দেহ করা হয় সিনেমা ব্লিউতে মাঝেমধ্যে যায় বলে। ড্রাগ বিক্রির একটা বড় স্পট ওটা। ওটার মালিক এক মহিলা। নাম স্টানা। লেডি স্টানা নামে ডাকে তাকে সবাই। তার সঙ্গে ম্যাকেঞ্জির বন্ধুত্ব আছে। পুলিশ জানে মহিলা ড্রাগ বিক্রির সঙ্গে জড়িত। নিয়মিত ঘুষ পায় বলে কোনও অ্যাকশনে যায় না। দলের খুব বড় কেউ না এই স্টানা মহিলা, মাঝারি কেউ হবে। আপনাকে আগে যেমন বলেছি, ওখান থেকে কাজ শুরু করাটাই আমাদের জন্যে ভালো হবে। আজ রাতে মহিলাকে ধরে থরো ইন্টারোগেট করা গেলে হয়তো অনেক তথ্যই পাওয়া যাবে, যেগুলো আমরা জানি না।'

চিকা মোস্তাকের কথা শেষ হওয়ার পর কোকের গ্লাস মুখ থেকে নামিয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে মিলি বলল, দু'একবার ডিবার্গ ম্যাকেঞ্জিকে সিনেমা ব্লিউতে দেখেছে সে। লেডি স্টানার অফিস থেকে বের হতে দেখেছে একবার।

মেয়েটার আয়ত চোখ দুটো সরাসরি রানার চোখে স্থির, অস্বস্তি বোধ করছে না মেয়েটা। রানার মনে হলো না সে ড্রাগ কার্টেলের প্ল্যান্ট। নিজেকে মনে করিয়ে দিল ও, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে

হবে ওকে।

রানার মনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগছে, ওখানে ডিবার্গ ম্যাকেঞ্জি কী করছিল। যৌন উত্তেজনার খোঁজে নিশ্চয়ই ওখানে যায়নি লোকটা?

তারপর মিলি বলল, সিনেমা ব্লিউতে জুটি ছাড়া ঢোকা যায় না। লেসবিয়ান বা হোমোসেক্সুয়াল কাপ্‌ল্‌ হলেও চলবে, কিন্তু একা যাওয়া চলবে না। অথচ ম্যাকেঞ্জি একাই গিয়েছিল। তাকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয় কোনও প্রশ্ন ছাড়াই।

মিলির কথায় রানার পরিকল্পনা করতে সুবিধা হলো। মিলিকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমা ব্লিউতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

বুল হাডসন। বাস্ক জাতির লোক। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ইউরোপ আর আমেরিকায় বক্সিং করত। চমৎকার শরীরটা এখন মোটা হয়ে গেছে। চেহারায় অজস্র কাটাকুটির দাগ আছে। বেশিরভাগই চোখের চারপাশে। স্পেনের চ্যাম্পিয়ন পেলোটা খেলোয়াড় ছিল। জানা যায় একবার বিয়ে করেছিল। ডিভোর্সের ব্যাপারে কিছুই জানা যায়নি। তার স্ত্রীর কোনও খোঁজও বের করা যায়নি। প্রচণ্ড শক্তি ধরে বুল হাডসন। তার ব্যাপারে তথ্য জোগাড় করা খুব কঠিন। অতীত সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা যায়নি। জিয়োলজিস্ট হিসেবে নিজের পরিচয় দেয়, তবে জিয়োলজির কিছুই সে জানে বলে মনে হয় না। টার্কিশ সরকারের কাছ থেকে তেলের জন্য প্রসপেক্টিং করবার লাইসেন্স আছে তার। সহজেই ওই লাইসেন্স পাওয়া সম্ভব। তাউরাস আর পুব অ্যানাতোলিয়ায় প্রসপেক্টিং করে সে। লেক ভ্যানের কাছেই বেশি সময় কাটায়। কোনও পুলিশ রিপোর্ট নেই তার নামে। কোনও ঝামেলা করেছে বলেও জানা যায় না। শহরে প্রায় আসে না বলে তার ব্যাপারে

তথ্য পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। স্পেনের নাগরিক, কিন্তু তুরস্কে থাকবার পারমিট আছে। এর ব্যাপারে দুটো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ—কুর্দি ভাষা বলতে পারে সে। কুর্দিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে। সিন্ডিকেটে সে ফিল্ড অর্গানাইযার হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। ধারণা করা হয় কুর্দিদের দিয়ে সে ড্রাগের চালান পাচার করবার কাজে নিযুক্ত। বর্ডার প্যাট্রল অবশ্য কখনোই তাকে হাতেনাতে ধরতে পারেনি। যেসব কুর্দিদের বন্দুকযুদ্ধের পর বন্দি করা হয়েছে তাদের মুখ খোলানো সম্ভব হয়নি। হাডসন সম্ভবত আতঙ্ককে কাজে লাগায়। মুখ খুললে সেই কুর্দির আত্মীয়-স্বজনকে খুন করা হবে, বা এধরনের কিছু।

ফাইল থেকে চোখ তুলল রানা। এরপর আছে ডক্টর ফ্রাঞ্জ হার্টয। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে আবার ফাইলে মনোযোগ দিল ও।

চিকা মোস্তাক কাঁপা হাতে নিজেও একটা সিগারেট ধরাল। মুখটা সামান্য হাঁ করে চুপচাপ বসে আছে সালমান রাশেদি, তার ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টি রানার উপর থেকে সরছে না প্রায় কখনোই।

'এবার ডক্টর ফ্রাঞ্জ হার্টয,' বলল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল মোস্তাক। 'সেই একই কাহিনী। কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি তার বিরুদ্ধে। লোকটা ডাক্তার তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বাবা ছিল নাজি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ডাক্তার। আর্জেন্টিনায় পালিয়ে যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। বাবার সঙ্গে প্র্যাকটিস করেছে লোকটা। তুরস্কে ডাক্তার প্রয়োজন বলে অনেক সুবিধে পেয়েছে সে। বড়লোক ক্লায়েন্টদের জন্যে একটা ক্লিনিক খুলেছে। ক্লিনিকের পাশাপাশি গরীবদের জন্যে আবার দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে তার। ফাইলটা পড়লে জানতে পারবেন।'

ডক্টর ফ্রাঞ্জ হার্টয। জার্মান। বসবাস আর কাজের পারমিট পেয়েছে তুর্কি সরকারের কাছ থেকে। বয়স ষাটের কাছাকাছি।

লম্বা মানুষ। কাঠির মতো সরু। আচরণ বুদ্ধিজীবীদের মতো। ইউরোপের দিকটায় বসফরাসের তীরে লিডো হোটেলের কাছে একটা স্যানাটোরিয়াম চালায়। গরীবদের চিকিৎসা বিনা পয়সায় করে বলে পুলিশ তার ব্যাপারে অত্যন্ত সহনশীল। ডিবার্গ ম্যাকেঞ্জি কয়েকবারই তার ক্লিনিকে হার্টের চিকিৎসা করিয়েছে। ধারণা করা হয় সিন্ডিকেট যাদেরকে অত্যাচার করতে চায় তাদের ক্লিনিকে ভর্তি করে ফ্রাঞ্জ হার্টয। রোগীকে ডেথ সার্টিফিকেট দিতে খুব একটা দেরি করে না সে। যে-কারও মুখ খোলাতে পারে সে সার্জিকাল ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করে। সিন্ডিকেটে তার পদ কী সেটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

চোখ তুলে চিকা মোস্তাকের দিকে তাকাল রানা, কিন্তু তাকে যেন ও দেখছে না। কাউকে প্রশ্ন করতে হলে ফ্রাঞ্জ হার্টযের হাতে তাকে তুলে দিলেই যথেষ্ট। চিকা মোস্তাককে শিউরে উঠতে দেখল ও। মনে হলো, কল্পনায় হার্টযের নির্যাতন দেখতে পাচ্ছে।

'বুঝতে পারছি ডাক্তারের কাজটা কী,' বলল গম্ভীর রানা। 'এবার শোনা যাক রনি রুথলেস সম্বন্ধে।'

'খুনি একটা,' চোখ থেকে হর্নরিমের চশমাটা নামাল চিকা মোস্তাক। রানা লক্ষ করল মোমবাতির আলোয় ফ্যাকাসে আর বিচলিত দেখাচ্ছে খুদে লোকটাকে। চোখের নীচে নীল টোপলা তৈরি হয়েছে। দেখলে মনে হয় ওসব জায়গায় কালি ঘষে দিয়েছে কেউ। চশমার কাঁচ পরিষ্কার করল সে। আজকেই ওর শেষ রাত এখানে, ভাবল রানা। অনুমতি দেবে ও, কালকের প্লেনেই রওনা হয়ে যাবে মোস্তাক বাংলাদেশের উদ্দেশে।

'আমরা রনি রুথলেসের আসল নামটাও জানি না,' বলল মোস্তাক। 'এর নাম শুনলেও শিউরে ওঠে লোকে। তথ্য নেই বলে রনি রুথলেস সম্বন্ধে ফাইলও করিনি আমি কিছু। মুখে বলছি।

রনিকে যারা দেখেছে আর মুখ খুলতে পারে, এমন কেউ এখন আর বেঁচে নেই। কোনও ছবি নেই তার। তিনমাস আগে মাওলানা আবদুল হামিদের সঙ্গে চুক্তিতে আসে সিন্ডিকেট, তখন থেকেই পরিস্থিতি গরম হয়ে উঠতে শুরু করে। তদন্ত শুরু করায় রানা এজেন্সির উপর আঘাতও তখন থেকেই আসতে থাকে। এজেন্ট যারা মারা গেছে তাদের প্রত্যেকের গলা কেটে দেয়া হয়েছিল। কাজটা রনি রুথলেসের নিজের বলেই ধারণা করছি। আন্দাজ করা হয় রনির বয়স তিরিশের কম। সম্ভবত হালকা-পাতলা মানুষ। পেন্সিল গোঁফ আছে। সুদর্শন। চুলের রং কালো। টাক্সেডো জ্যাকেট পরতে ভালোবাসে। চোখের রং কুচকুচে কালো।'

'আমি তো ভেবেছিলাম তার ব্যাপারে কিছুই জানা যায়নি,' বলল রানা। 'এখন দেখছি অনেক কিছুই জানেন।'

'আসল তথ্য বলতে কিছুই তো নেই,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল চিকা মোস্তাক। রানা খেয়াল করল হাত কাঁপছে তার অল্প-অল্প। 'শহরের নানা বাজে আড্ডার ওয়েইটার, বারটেন্ডারদের কাছ থেকে টুকরো তথ্য সামান্য যা জানা গেছে তা-ই। এসব তথ্যের সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হবার উপায় নেই। যখনই খবর পাওয়া গেছে কেউ তাকে চেনে, গিয়ে তার গলা কাটা লাশ মিলেছে। একজন শুধু বলে যেতে পেরেছিল রনি রুথলেস এসেছে আমেরিকার শিকাগো থেকে। পরে বসফরাসে লোকটার গলা কাটা লাশ পাওয়া যায়। খুন করতে একটা ক্ষুর ব্যবহার করে রনি রুথলেস। গলা দু'ফাঁক করে দেয়। বিকৃত রুচির মানুষ। ব্যস, আর তেমন কিছু জানি না। রানা এজেন্সির ওপর শেষ আক্রমণের পর হঠাৎ করেই ডুব মারে সে।'

'যান, একটা ঘুম দিন এবার,' বাংলায় বলল রানা। 'আজ রাতে আমার সঙ্গে সিনেমা ব্লিউতে যাচ্ছেন আমার বান্ধবী

হিসেবে।'

'কী না করতে হয় রানা এজেন্সির চাকরি করতে হলে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল চিকা মোস্তাক। আড়মোড়া ভাঙল। 'আশা করি কাউকে আপনি বলে দেবেন না পরে?'

মৃদু মাথা নাড়ল রানা। ক্ষণিকের জন্য খটকা লাগল ওর। মোস্তাকের আড়মোড়া ভাঙবার মধ্যে কী যেন আছে, ঠিক ধরতে পারেনি ও। কী?

জরুরি কথা ফুরিয়ে যেতেই টিপটিপ করে পানি গড়ানোর আওয়াজটা বাদে গুহার ভিতর থমথমে নীরবতা নামল। একটা বেনসন ধরাল রানা। চিকা মোস্তাক বিদায় নিয়ে চলে গেল খুপরির মতো ছোট ঘরগুলোর একটায়। ঘুমাবে সে। ফিরে আসবার পর থেকেই বারবার হাই তুলেছে মোস্তাক। সারারাত জাগবার ফল।

সর্বক্ষণ একটা পাইপ টানছে রাশেদি। এরইমধ্যে রানাকে তার সাধা হয়ে গেছে বার কয়েক। কথা বলতে না পারলেও ইশারায় বুক চাপড়ে জানিয়েছে রানা আসায় কতোটা খুশি হয়েছে সে। তার পাইপের কটুগন্ধী ধোঁয়া রানার নাকে এসে লাগছে। সারারাত পাহারা দেওয়ায় একটু পর সে-ও চলে গেল ঘুমাতে।

মেয়েটাও উঠল। ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'ঘুমাতে যাব আমি। আমার সঙ্গে কোনও কথা আছে?'

'আপাতত না,' বলল রানা। 'পরে একা কথা বলব।'

চলে গেল মিলি গঞ্জালেস। পেরিয়ে গেল আরও আধ ঘণ্টা। যে খুপরিতে মিলি ঘুমাচ্ছে সেখান থেকে কোনও আওয়াজ আসছে না। খুপরির দিকে একবার পা বাড়িয়েও থেমে গেল রানা। ঘড়ি দেখল। হাতে এখনও অনেক সময় আছে। যা ওকে করতে হবে সেটা পরে করলেও চলবে। মেঝেতে পাতা কম্বলে শবাসনে শুয়ে চোখ বুজল ও, তলিয়ে গেল ধ্যানের অতলে। মনটা শান্ত করে

প্রথম থেকে ভাবতে শুরু করল কী ঘটেছে।

লন্ডনে ছিল ও, সেখানেই আচমকা পৌঁছায় মোস্তাকের রিপোর্ট। রানার মনে হয়েছিল মাথায় বাজ পড়েছে ওর। ঢাকায় হেডঅফিসে ছুটির দরখাস্ত করেই ইস্তাম্বুলে ছুটে আসতে চেয়েছিল ও। মেজর জেনারেল রাহাত খানের নির্দেশে লন্ডনে ওর সঙ্গে দেখা করেন শামশের আলী, প্রয়োজনীয় কিছু ইকুইপমেন্ট দেন ওকে। রাহাত খানের ফোন পায় ও। তাঁর সঙ্গে আলাপে ঠিক হয় আলেকযান্দ্রিয়া থেকে ইস্তাম্বুলে ঢুকবে ও এস এস ব্ল্যাকবার্নের অয়েলার হিসাবে।

গভীর করে শ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়ল রানা। মোস্তাকের কথা ভাবা যাক এবার। ওর রিপোর্ট আবার খতিয়ে দেখতে হবে। গভীর শ্বাস নিয়ে সমস্ত মনোযোগ একত্রিত করল রানা।

মোট চারজন ওরা—ডিবার্গ ম্যাকেঞ্জি, বুল হাডসন, ডক্টর ফ্রাঞ্জ হার্টয আর রনি রুথলেস। তুরস্কে ড্রাগ ব্যবসার মাথা এরা। সরকারের ঊর্ধ্বতন অনেক কর্মকর্তাই এদের পকেটে। পুলিশের অনেকেও তাদের কেনা।

বিসিআইয়ের নির্দেশে তাদের বিরুদ্ধে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করছিল রানা এজেন্সি, আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে অফিসটা। মোস্তাক ছাড়া অন্য চারজন এজেন্ট খুন হয়েছে। তাদের লাশ পাওয়া গেছে বসফরাসে। প্রত্যেককে হাই ডোজ কোকেন ইঞ্জেক্ট করা হয়। মারা যাওয়ার আগে কেটে দেওয়া হয় তাদের গলা। লাশগুলো পাওয়া গেছে মারা যাওয়ার বেশ কয়েকদিন পর। কাজটা সম্ভবত রনি রুথলেসের। পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী, রানা এজেন্সির সব ক'জন তরুণ এজেন্ট ড্রাগ অ্যাডিক্ট ছিল। ড্রাগ সংক্রান্ত বিরোধে ড্রাগ দেওয়ার পর খুন করা হয় তাদের। জীবনের উপর হুমকি আছে বুঝে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে ইস্তাম্বুল

শাখার চিফ চিকা মোস্তাক।

চিকা মোস্তাকের রিপোর্টে বলা হয়েছে, পাকিস্তান ফেরত স্বঘোষিত মাওলানা আবদুল হামিদ এই ড্রাগ লর্ডদের কাছ থেকে কয়েকশো কোটি টাকার হেরোইন আর কোকেনের চালান কিনছে। আফগানিস্তানের ড্রাগ ব্যবসায়ীদের চেয়েও কম দামে হেরোইন আর কোকেন দিচ্ছে তাকে তুরস্কের ড্রাগ কার্টেল।

কুঁচকে ওঠা ভ্রূ সমান করল রানা। ড্রাগ বিক্রির টাকায় নিজের গোপন সংগঠনের জন্য অস্ত্র কিনবে মাওলানা আবদুল হামিদ, অনেক গুণ বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে। টাকা দিয়ে দলে টানবে অজস্র বেকার হতাশাগ্রস্ত যুবককে। তরুণ সমাজের বিরাট একটা অংশকে ড্রাগের উপর নির্ভরশীল করে তুলবে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে ধর্মীয় তৎপরতার জন্য বিরাট অংকের টাকা অনুদান পেয়েছে সে। আপাতত তুরস্কে অবস্থান করছে সে।

চিকা মোস্তাক জানিয়েছে, রানা যদি পরিস্থিতি সামলাতে নিজে আসতে চায় তা হলে বৈধ কোনও পথে তুরস্কে ঢোকা চলবে না ওর। ড্রাগ কার্টেল সেক্ষেত্রে ওকে খুন করে ফেলবার মস্ত সুযোগ পাবে। চারদিকে তাদের চর ঘুরছে। পুলিশের সহায়তাও পাওয়া যাবে না। রানাকে তুরস্কে ঢুকতে হবে গোপনে। কীভাবে তা সম্ভব সে-ব্যাপারেও আভাস দিয়েছে চিকা মোস্তাক। আগেই ওয়ায়ারলেস করতে হবে তার কাছে। ও কীভাবে আসছে জানলে চিকা মোস্তাক ওকে রিসিভ করবে। সেভাবেই সব ঠিক করে এসেছে ও, অথচ ওর আগমনের কথা আগেই ফাঁস হয়ে গেছে। কীভাবে? জবাব নেই।

অন্য প্রসঙ্গে মন দিল রানা। এই চিন্তাটা গত কয়েকদিন মাথা থেকে দূর করতে পারেনি ও।

জোর করে নেশা করিয়ে তারপর গলা কেটে দিয়ে হত্যা করা

হয় রানা এজেন্সির চারজন তরতাজা তরুণ এজেন্টকে। তাদের অ্যাডিক্ট বলে চালানো হয়েছে। প্রত্যেকের হাসিখুশি চেহারাগুলো স্পষ্ট দেখতে পেল রানা চোখের সামনে। হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে গেল ওর, পরমুহূর্তে ঢিল দিল পেশিতে। ওর নিজের হাতে তৈরি চারজন দেশপ্রেমিক যুবক। শেখ আবদুর রহিম, হাকিম হাশেমী, শহীদ রহমান আর নিখিল চক্রবর্তী। বিসিআইয়ের নির্দেশে মাওলানা আবদুল হামিদের ব্যাপারে তদন্ত করছিল ওরা। একমাত্র মোস্তাক বেঁচে আছে এখন। পালাতে হয়েছে তাকেও।

ধ্যান করতে গিয়েও মনটা শান্ত রাখতে পারছে না রানা। প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে অন্তরে, প্রচণ্ড আক্রোশ অনুভব করছে ও বুকের ভিতর। বেশ অনেকক্ষণ পর সিদ্ধান্ত নিল রানা, ড্রাগ লর্ডদের বন্দি করতে হবে ওকে, গোপনে আটকে রেখে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে, কর্তৃপক্ষ যাদের ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ নষ্ট করতে হবে, যাতে ড্রাগ লর্ডদের ন্যায় বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানো যায়। তবে রনি রুথলেস। ধ্যানাবস্থায় শান্ত মনে সিদ্ধান্ত নিল রানা: তাকে খুন করবে ও। লোকটা ওর ছোট ভাইয়ের মতো ছেলেগুলোকে গলা কেটে হত্যা করেছে।

এবার মিলি গঞ্জালেস। কী জানা গেছে তার সম্বন্ধে? মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। বাবা-মা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাবার পর অসৎ বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে বখে যায়। ড্রাগ ধরে। এক সময় পরিচয় হয় তার চিকা মোস্তাকের সঙ্গে, চাকরি নেয় রানা এজেন্সিতে। তখনই সেরে উঠতে চেষ্টা করে সে, চিকিৎসা নেয় একটা ক্লিনিকে। তবে ক্লিনিক থেকে বেরিয়েও মোস্তাকের পরামর্শে ড্রাগ কিনতে থাকে, সেই সঙ্গে কার্টেলের বিভিন্ন আড্ডায় ঢু মেরে তথ্য সংগ্রহ শুরু করে। প্রশ্ন হচ্ছে: সে রানা এজেন্সির ইনফর্মার,

না ড্রাগ কার্টেলের?

ঝাড়া একঘণ্টা পর শবাসন থেকে ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল রানা। উঠল ঠিক চার ঘণ্টা পর। ঘড়ি দেখল। সময় হয়েছে। একটা বড় টর্চ সংগ্রহ করে মিলি গঞ্জালেস যে খুপরিতে আছে সেটায় চলে এলো ও। টর্চের আলোয় দেখল অঘোরে ঘুমাচ্ছে মেয়েটা। ধীরে শ্বাস ফেলছে। মাথার নীচে এক হাত রেখে কাত হয়ে শুয়েছে।

শক্তিশালী টর্চের আলো মেয়েটার চোখের উপর ফেলল রানা। অস্ফুট একটা ভীত আওয়াজ করে জেগে উঠল মিলি।

'ভয় পেয়ো না, আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাজটা করতে হচ্ছে। তোমার পোশাক খুলে ফেলো।'

'কীহ্!' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল মিলি। চোখ কুঁচকে আলোর দিকে চেয়ে আছে। তার পরনে পোশাক আছে, তবু পাতলা কম্বলটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরল।

'একবারই মাত্র ব্যাখ্যা করব আমি, মিলি,' বলল রানা। 'তারপর যদি তুমি কথা না শোনো তা হলে জোর করে তোমার কাপড় খুলতে হবে আমাকে। তুমি বলেছ তুমি এখন আর অ্যাডিক্ট নও। আমাদের আশ্রয় চেয়েছ। আমরা নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছি। হয়তো তোমার কথাই সত্যি, এখন আর তুমি ড্রাগ নাও না। আমি আশা করি সেটাই সত্যি। কিন্তু নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, তোমার কথা অন্ধের মতো বিশ্বাস করতে পারি না আমি? এবার পোশাক খুলে ফেলো। আমি দেখতে চাই তোমার শরীরে সিরিঞ্জের নতুন কোনও দাগ আছে কি না। ভেবো না আনন্দ পাবার জন্য কাজটা করছি আমি, করতে হচ্ছে এটা আমার দায়িত্ব বলে।'

'ইয়োক!' তুর্কিদের সত্যিকারের "না" যাকে বলে। চৌকিতে

উঠে বসেছে মিলি। কম্বলটা এখনও শক্ত করে বুকের সঙ্গে ধরে আছে। 'আপনি ভয়ানক অন্যায় করছেন আমার প্রতি। এ-কাজ আমি কিছুতেই করব না।'

'করতেই হবে মিলি,' রাগল না রানা। 'দেরি কোরো না। আমি তা হলে বাধ্য হবো কাজটা নিজ হাতে করতে।'

ঠোঁট কাঁপছে মিলির। 'মাফ করে দিন। আমি পারব না।'

'সম্ভব নয়, মিলি। যা বলছি করো।' ক্রমেই কঠোর হয়ে উঠছে রানার গলা।

ভীতা হরিণীর মতো চারপাশে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ছুঁড়ল মিলি।

'চিৎকার করে সাহায্য চেয়ে কোনও লাভ নেই, মিলি। কেউ তোমাকে সাহায্য করতে আসবে না। ওরা জানে নিজের কাজ বুঝি আমি।'

দ্বিধার ছাপ ফুটে উঠল মিলির চেহারায়। কম্বলটা ধরতে হাত বাড়াল রানা। আলোর আভায় রানার কঠোর চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে মিলি। শরীর মুচড়ে সরে গেল। 'ইয়োক! আমি...আমিই করছি।'

'গুড।' এক পা পিছিয়ে টর্চের আলো মিলির দেহে ফেলল রানা। 'অনেক ঝামেলা কমবে তা হলে। পোশাক খুলে উপুড় হয়ে শোবে তুমি।'

চৌকির কিনারায় বসে কাপড় খুলতে শুরু করল মিলি। রাগে ওর চেহারা থমথম করছে। ভ্রূ কুঁচকে রেখেছে। 'সারাজীবন এজন্যে আপনাকে ঘৃণা করব আমি,' হিসহিস করে বলল। 'সারাজীবন! যদি অনেক বছর বাঁচি তো অনেক বছর ধরে আপনাকে আমি...'

'চুপ করে কাজ করো,' ধমক দিল রানা। 'যতো তাড়াতাড়ি কাপড় খুলবে ততো তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ হয়ে যাবে।'

ব্লাউজের বোতাম খুলল মিলি, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ব্লাউজটা খুলে ফেলল। ওটা চৌকিতে এক পাশে রেখে এবার খুলতে শুরু করল কালো স্ট্রেচ প্যান্ট।

'ব্রেসিয়ারও খুলতে হবে,' নির্দেশ দিল রানা। 'আমি চাই তুমি সব খোলো।'

দু'চোখ ভরা ঘৃণা নিয়ে রানাকে দেখল মিলি। 'নোংরা মনের মানুষ তুমি, মাসুদ রানা! তুমি মেয়েদের উলঙ্গ দেখে বিকৃত আনন্দ পাও।'

'তুমি কিন্তু দেরি করছ।' এক পা সামনে বাড়ল রানা।

'ইয়োক!'

দু'হাত পিছনে নিয়ে ব্রেসিয়ারের হুক খুলল মিলি, তারপর খুলে ফেলল ব্রেসিয়ার। রাগে ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে ও। সুগঠিত স্তন লুকানোর কোনও চেষ্টা না করে বলল, 'এবার তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ, মাসুদ রানা?'

'না।' রানা নির্বিকার। 'এবার প্যান্ট খোলো।'

রানার দিকে না তাকিয়ে নির্দেশ পালন করল মিলি। প্যান্টের নীচে চিকন একটা কালো প্যান্টি পরে আছে সে। টর্চের আলোয় ধবধবে ফর্সা ত্বকের কারণেই হয়তো অদ্ভুত সুন্দর আর নিষ্পাপ লাগছে মিলিকে দেখতে। ফোঁপাচ্ছে এখন মিলি। রানা পাত্তা দিল না। শীঘ্রি জানা যাবে মিলি ড্রাগ কার্টেলের সদস্য কি না। সেটা জানাটাই জরুরি।

'প্যান্টি খুলে ফেলো।'

মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল মিলি। দুর্বল কণ্ঠে বলল, 'অসম্ভব। এ আমি পারব না।'

টর্চ নাড়ল রানা। 'তা হলে আমার নিজেরই…'

'হায়ির!' আগের চেয়ে নরম "না" এটা। 'আমি…আমিই

খুলছি।'

প্যান্টের পাশে মেঝেতে স্থান পেল সরু কালো প্যান্টি।

'এবার কটে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো।'

'কথা দিচ্ছ...দিচ্ছেন আপনি আমাকে ছোঁবেন না?'

'দিচ্ছি। শোও।'

উপুড় হয়ে শুলো মিলি। এক পা সামনে বেড়ে রানা লক্ষ করল মেয়েটা আড়ষ্ট হয়ে উঠছে। 'কোনও চিন্তা নেই,' মিলিকে সহজ করবার জন্য বলল ও। 'বেশিক্ষণ লাগবে না।'

পায়ের পাতা থেকে শুরু করল রানা। টর্চের আলোয় ধীরে ধীরে দেখছে রানা, ওর অভিজ্ঞ চোখ সিরিঞ্জের ফুটোর তাজা দাগ খুঁজছে। অল্প-অল্প কাঁপছে মিলির শরীর। কাজের ফাঁকে রানা জিজ্ঞেস করল মিলি কখনও অ্যাথলেট ছিল কি না।

'ছিলাম। ছোটবেলা থেকেই চর্চা করেছি। তারপর...তারপর ড্রাগ নিয়ে সব শেষ হয়ে গেল।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। কতো জ্বলজ্বলে প্রতিভা যে সর্বনাশা ড্রাগের কারণে অসময়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার হিসাব কে রাখে! একটা সময় আসে যখন অ্যাডিক্টদের দিন কাটে পরবর্তী ডোজের কথা চিন্তা করে। ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি—কী না করে তারা ড্রাগ নিয়ে সামান্য সময়ের স্বস্তি পেতে।

হাঁটু, তারপর ঊরু হয়ে সরু কোমরে চলে এলো রানার টর্চের আলো। মিলির কাঁধ মেয়েদের তুলনায় সামান্য চওড়া। এখনও পর্যন্ত মসৃণ কোমল ত্বকে ইঞ্জেকশনের নতুন-পুরোনো কোনও দাগ দেখেনি রানা। একটা তিলও নেই মিলির ধবধবে সাদা দেহে।

'ঠিক আছে, এবার চিৎ হও।'

আবার তর্ক আশা করেছিল রানা, কিন্তু পাশ ফিরে আস্তে করে চিৎ হয়ে শুলো মিলি, চোখ বন্ধ করে রেখেছে। একটা নতুন দাগ

এখনও পায়নি রানা। তবে আরও কয়েকটা জায়গা খুঁজতে এখনও বাকি আছে।

'স্তন তুলে ধরো,' নির্দেশ দিল রানা।

বাদামী চোখ দুটো মেলে অসহায় দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল মিলি। 'কী বললেন?'

'স্তন দুটো হাত দিয়ে তুলে ধরো, যাতে আমি স্তনের তলা আর পাঁজরের কাছটা দেখতে পাই।'

আবার চোখ বন্ধ হয়ে গেল মিলির। নির্দেশ পালন করল সে।

নেই কোনও দাগ।

তারপর দেখতে পেল রানা ওগুলো। অজস্র ছোট ছোট সাদা দাগ, কাঁধ আর বাহুর উপরের অংশে। দু'কাঁধ এবং দু'বাহুতেই দাগ আছে। বোঝাই যাচ্ছে পাঁড় অ্যাডিক্ট হয়ে পড়েছিল মিলি।

এখনও অ্যাডিক্ট। সিরিঞ্জের নতুন দাগগুলো দগদগ করছে। তার মানে ড্রাগ কার্টেলের চর ও!

'দাগগুলো প্রমাণ করে তুমি ড্রাগ কার্টেলের প্ল্যান্ট,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'ইয়োক!' চোখ বড় বড় করে রানাকে দেখল মিলি। 'বিশ্বাস করুন, আমি কার্টেলের লোক নই।'

'তা হলে ড্রাগ নিচ্ছ কেন? তুমি তো বলেছ তুমি আর ড্রাগ নাও না। সিরিঞ্জের দাগ কেন তোমার গায়ে?'

'মিস্টার মোস্তাকের পরামর্শে সিরিঞ্জ দিয়ে নিয়মিত হাত ফুটো করেছি আমি,' বলল মিলি। 'কার্টেলের বিভিন্ন জয়েন্টে যেতে হলে কাজটা আমাকে বাঁচার জন্যেই করতে হতো। নইলে ওরা ধরে ফেলত আমি তথ্য জোগাড় করতে ওসব জায়গায় যাই। বিশ্বাস না হলে মিস্টার মোস্তাককে জিজ্ঞেস করতে পারেন। তাঁর কথা মতো ড্রাগ কিনতাম আমি, তাঁর কাছেই সব জমা দিতাম।' একটু দ্বিধা

করল মিলি। 'কিন্তু মিস্টার মোস্তাক...' কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল সে।

মিলির চোখের দিকে তাকাল রানা। অপলক ওকে দেখছে মেয়েটা, দু' চোখে স্পষ্ট আকুতি। ওকে বিশ্বাস করতে অনুরোধ করছে নীরবে। ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'ঠিক আছে, এবার পোশাক পরতে পারো তুমি।'

'আপনি টর্চ নিয়ে চলে যান,' অনুরোধ করল মিলি। 'আমি অন্ধকারেও পরতে পারব।'

এবার মিলির কথাই রাখল রানা, বেরিয়ে এলো খুপরি থেকে। পিছনে শুনতে পেল মিলির ফোঁপানোর আওয়াজ। একটু পর কাপড়ের খসখস থেমে গেল, মিলি কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এখন আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন?'

'কিছুটা,' জবাব দিল রানা।

মিলি বেরিয়ে এসেছে খুপরি থেকে, 'আপনি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।' এখন ওর গলাতে আর আগের সেই উষ্মা নেই।

রানা বলল, 'যে কাজটা করতে হলো সেজন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। তবে না করে আমার কোনও উপায়ও ছিল না। আমাকে নিশ্চিত হতে হবে তুমি কার্টেলের প্ল্যান্ট নও। এখনও আমি নিশ্চিত নই। এব্যাপারে মোস্তাকের সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাকে।'

মিলির বাদামী আয়ত চোখে কোমল দৃষ্টি ফুটল। পাপড়িতে টলটল করছে জল। 'জানি আমি ওরা কতোটা ভয়ানক। ধ-ধন্যবাদ আপনাকে, রানা। আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে জোর করে...এখনও আপনি আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না?'

'বিশ্বাস সময়ে আসে, মিলি,' নরম সুরে বলল রানা। 'হয়তো পরে তোমাকে আমি এতো বিশ্বাস করব যে তোমার জন্যে জীবনের

ঝুঁকি নিতেও বাধবে না আমার। যাক ওসব কথা। এখন প্রথম কাজ হচ্ছে মোস্তাককে ওঠানো। আজ রাতের জন্যে ওকে তৈরি করতে হবে। অন্তত এমন মেকআপ চাই যাতে ওকে দেখে মহিলা মনে হয়। তোমার সাহায্য লাগবে।'

পরস্পরের দিকে তাকাল মিলি আর রানা। আস্তে আস্তে মুক্তোঝরা দুষ্টু হাসি ফুটে উঠল মিলির মিষ্টি চেহারায়। 'মিস্টার মোস্তাককে মেয়ে বানাবেন? মেকআপ দিতে দারুণ মজা পাব আমি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হা!'

'এসো তা হলে।'

রানার পিছু নিয়ে মোস্তাকের খুপরির দিকে পা বাড়াল মিলি। রানা আর মিলি, দু'জনই অনুভব করছে, পরস্পরকে পছন্দ হয়ে গেছে ওদের। মনের মাঝে অসহায় মেয়েটার জন্য অদ্ভুত একটা মমতা অনুভব করছে রানা।

মোস্তাক ঘুম থেকে উঠেছে। মিলিকে যে সে-ই সিরিঞ্জ দিয়ে হাত আর কাঁধ ফুটো করতে বলে দিয়েছিল সেটা প্রশ্ন করে জানতে পারল রানা। মিলির ব্যাপারে সম্পূর্ণ সন্দেহ দূর হয়ে গেল ওর মন থেকে।

চার

লা সিনেমা ব্লিউ। নীল ছায়াছবি দেখাবার প্রেক্ষাগৃহ। গ্যালাটা

ব্রিজের কাছে ইজিপশিয়ান বাজার সেক্টরের পাশেই জায়গাটা। ওটাকে অভিজাত দেখানোর কোনও রকমের চেষ্টাই করা হয়নি মালিক পক্ষের তরফ থেকে। দু'পাশের দুটো নীল দরজার উপর ঝুলছে লা সিনেমা ব্লিউ লেখা দুটো নিয়ন সাইন। ভিতরে খাবারদাবার, ড্রিঙ্কস্ সরবরাহ আর নীলছবি দেখানোর ব্যবস্থা। এ ছাড়াও আছে পুডল অ্যাক্ট, স্নেক ড্যান্স আর স্ট্রিপ ড্যান্সিং দেখবার সুযোগ।

মাঝরাত প্রায় হতে চলল। লা সিনেমা ব্লিউয়ের ভিতরের পরিবেশে আকাঙ্ক্ষার ছোঁয়া লেগেছে। নানা ধরনের জোড়া হাজির হয়েছে নীল ছায়াছবি দেখতে। নারী-পুরুষ, নারী-নারী, পুরুষ-পুরুষ। বারের উপরে দেয়ালে আটকানো ঘড়িটা বারবার উৎসুক নজরে দেখছে তারা। নিজেদের ঘড়ি মিলিয়ে নিচ্ছে ওটার সঙ্গে। তবে একটা যুগল অন্যদের চেয়ে দূরে এক কোণে বসে নিজেদের নিয়েই মগ্ন হয়ে আছে।

ইস্তাম্বুল সাদাপোশাকধারী পুলিশ ফোর্সের হামজা বে ওই জোড়াটাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তবে বুঝবার তেমন কোনও চেষ্টা বা গরজও তার নেই। দিনের পর দিন এখানে ডিউটি দিতে গিয়ে কতো আজব জুটি যে সে দেখেছে তা গুনে শেষ করা যাবে না। আজ তিন মাস হলো সে আর আজিজ শাহ্ উপরওয়ালার নির্দেশে লেডি স্টানার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দিকটা দেখছে। তবুও ছোট্ট টেবিল নিয়ে ওই অন্ধকার কোণে বসে থাকা দু' জনের সত্যিই কৌতূহল উদ্রেক করবার ক্ষমতা আছে। ওরকম বেমানান জোড়া সহজে দেখা যায় না। লোকটা অবশ্য দেখতে মন্দ না, কিন্তু কী কাপড় পরে আছে, ছিহ্! আর মহিলাটা যেমন বেঁটেখাটো, তেমনই রোগা; এক কথায় বিচ্ছিরি দেখতে। নাক কুঁচকাল হামজা বে। সে জীবনেও ওই মহিলার

সঙ্গে…‘পারনউ’-এ চুমুক দিল হামজা বে। ‘রাকি’ কড়া বলে ওটা সে তেমন পছন্দ করে না। রীতিমতো বিরক্তিই লাগছে তার মহিলার কথা ভাবতে গিয়ে। বিড়বিড় করল, ‘একমাত্র আল্লাহই জানে, দু’জন ওরা কী পেল দু’জনের ভেতর!’

তবে এটা মানতেই হবে যে ভালোবাসা সবসময়ই বড় অদ্ভুত। ওই দু’জন বোধহয় পরস্পরকে জান দিয়ে ভালোবাসে। যেভাবে মেল পার্টনার মহিলার কানের কাছে মুখ নিয়ে সারাক্ষণ ফিসফিস করছে তাতে তো তা-ই মনে হয়। আরেক চুমুক পারনউ গিলল হামজা বে। বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই সিনেমা ব্লিউ যেমন জায়গা তাতে অনেক আজব সম্পর্ককেই ভালোবাসার কাতারে ফেলা যায়। বারের উপরের ঘড়িটা দেখল হামজা বে। রাত বারোটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। বারোটা বাজলেই যাদের কাছে কার্ড আছে তারা উপরে ছুটবে নোংরা সিনেমা দেখতে।

আপন মনে কাঁধ ঝাঁকাল হামজা বে। নীলছবি এখানে যা দেখানো হয় সেসবের বেশিরভাগই তার দেখা হয়ে গেছে। কোনওটাই বাস্তবসম্মত বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সিরিয়া থেকে আসা আর সবকিছুর মতোই তৃতীয় শ্রেণীর মাল। বাজে অভিনয়, পর্যাপ্ত লাইটিঙের অভাব, ক্যামেরাম্যানের অদক্ষতা; সব মিলিয়ে উত্তেজনার বদলে বিরক্তিই উৎপাদন করে। হামজা বে বারের টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এবার তাকে লেডি স্টানা নিরাপদে আছে কি না দেখতে যেতে হবে। ঠিক বারোটায় তার ছুটি। তারপর আজিজ শাহ্ মরুক দোজখি বেটির নিরাপত্তা দেখে।

অন্ধকার কোনায় ছোট্ট টেবিলে বসা রোমান্টিক যুগল হামজা বে’কে উঠে যেতে দেখল। পুরুষটা তার কলার ধরে আবার টানাটানি করল। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। নোংরার কথা বাদ দিলেও স্যাফ্রন শার্টটা দু’সাইজ ছোট। টাইটা ঢিলে করে স্বস্তির

শ্বাস ফেলল সে, পাশে বসা মহিলার সঙ্গে ঝুঁকে পড়ে কথা বলল।

'এটাই তো ওর শেষ বারের মতো লেডি স্টানাকে দেখতে যাওয়া?'

মহিলার শক্ত উঁচু চুলের উপর একটা স্কার্ফ প্যাঁচানো আছে। হর্নরিমের চশমাটার কারণে তাকে পোয়াতি পেঁচার মতো লাগছে দেখতে। দামি একটা নীল ফ্রক পরেছে সে, ওটা হয়তো সত্যিকারের কোনও মহিলা পরলে ভালোই দেখাত। নিকোটিনের দাগওয়ালা দু'আঙুলের ফাঁকে আটকে একটা সিগারেট ধরাল মহিলা। তার হাতটা কাঁপছে অল্প অল্প।

'হ্যাঁ। আর কয়েক মিনিট পর চলে যাবে ও। আজিজ শাহ্ নামের আরেকজন আসবে। প্রথমেই লেডি স্টানা ঠিক আছে কি না দেখতে যাবে সে, তারপর ছুটবে ওপরে ব্লু সিনেমা দেখতে।' হাসল মহিলা, হঠাৎ করেই তার গলাটা যেন পুরুষালী শোনাল। 'বয়স কম আজিজ শাহ্র। নীলছবি এখনও ওকে টানে। এটা আমাদের জন্যে বিরাট একটা সুযোগ। তবুও, অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে আমার, বস্, আজকে কপালের সাহায্য লাগবে আমাদের।'

টেবিলের তলা দিয়ে মহিলার হাঁটুতে বেশ জোরেই একটা লাথি চালাল রানা। 'ওহ্!' বলে উঠল মহিলা।

'চরিত্র থেকে সরবেন না,' সাবধান করল রানা। 'গলা সামলান। নিজেকে সুন্দরী কোনও প্রেমিকা ভাবুন। জানি, আপনি ডেট হিসেবে একেবারেই অচল, তবুও আপনি ছাড়া এই মুহূর্তে আমার আর কেউ নেই।' ঘড়ির দিকে তাকাল রানা। 'বারোটা বাজতে আর এক মিনিট। এরপর কী ঘটবে?'

'তিনবার বাতি জ্বালবে নেভাবে কর্তৃপক্ষ। তার মানে হচ্ছে পনেরো মিনিটের মধ্যে নোংরা ছবি শুরু হবে। যাদের কাছে কার্ড

আছে তারা ওই কোনার লোহার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠবে। ওপরে লম্বা একটা ঘর আছে। চেয়ার, কাউচ আর সোফা দিয়ে সাজানো। এছাড়া আছে একটা স্ক্রিন আর প্রজেক্টর।'

'কার্ড কীভাবে পেতে হয়?'

'লেডি স্টানা নিজেই সরাসরি কার্ড দেয়। যা শুনেছি তাতে মহিলা খুব একটা কড়া নয়, যদি আপনার কাছে টার্কিশ দশ পাউন্ড থাকে।'

'লেডি স্টানা নিজে সিনেমা দেখতে যায় কখনও?'

'সাধারণত না। মহিলা লেসবিয়ান। বেশিরভাগ সময়ই অফিসে বসে কাটায় সে।'

নীরবে কিছুক্ষণ ধূমপান করল রানা। 'এই বাড়ির পিছন দিকটায় কী আছে?'

'ছোট একটা উঠান। ময়লা ফেলে রাখা হয়েছে ওখানে। তারপরেই আছে দশ ফুট উঁচু একটা দেয়াল। ওটার ওপরে কাঁচের টুকরো বসানো।'

'ওটা পার হওয়া সম্ভব।'

'যদি পার হলেন তো মরলেন, বস্,' বলল চিকা মোস্তাক। 'হর্ন থেকে একটা ছোট খাল এসেছে দেয়ালের পিছনে। পচা পাঁকে ভরা খাল! থকথকে কাদার ভেতর নৌকাও চলে না।'

লা সিনেমা ব্লিউ যেটাকে চেয়ার বলে সেই ভয়াবহ অত্যাচারের মধ্যে নড়েচড়ে একটু আরাম করে বসবার চেষ্টা করল রানা। টাইট প্যান্টের কাছে ওর শক্ত পেশিও হার মেনেছে, কোমর ধরে আসতে চাইছে। কষ্টের ষোলো কলা পূর্ণ করতে কোমরে গোঁজা ওয়ালথারটাও খোঁচা মারছে কিছুক্ষণ ধরে।

বাতি জ্বলতে নিভতে শুরু করল। তিনবার জ্বলল-নিভল। ক্ষণিকের জন্য নীরবতা নামল ঘরে, তারপর আবার আলাপ শুরু

করল সবাই। কেউ সিগনালটাকে তেমন পাত্তা দিচ্ছে বলে মনে হলো না। গ্লাসের ঠোকাঠুকির টুং-টাং, নীল ধোঁয়ার এঁকেবেঁকে উপরে উঠে যাওয়া–সব আগের মতোই আছে। মাঝে মাঝে মেয়েদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠের হাসির আওয়াজ কথাবার্তার গুঞ্জন ছাপিয়ে উঠছে। তারপর যেন অদৃশ্য কোনও জাদুকর ইঙ্গিত দিল, সঙ্গী নিয়ে নিঃশব্দে দোতলায় উঠতে শুরু করল লোকজন।

কোনার টেবিলে বসা রানা আর চিকা মোস্তাক উঠল না। ছোট্ট বারের কাছে হামজা বে'কে ফিরে আসতে দেখল ওরা। আরেকজন সাদাপোশাকধারীর সঙ্গে কী যেন আলাপ করল সে, তারপর বেরিয়ে গেল লা সিনেমা ব্লিউ থেকে। অপেক্ষাকৃত কমবয়সী পুলিশ আজিজ শাহ্। বারে দুটো ড্রিঙ্ক নিল সে, তারপর পিছনের একটা করিডর ধরে অদৃশ্য হলো।

'রেগুলার রুটিন,' বলল চিকা মোস্তাক। 'প্রথমে স্টানা ঠিক আছে কি না দেখবে ও, তারপর ছুটবে দোতলায় নীলছবি দেখতে। ও যাওয়ার পর তো আমরা যাব? তাড়াতাড়ি যা হওয়ার হয়ে গেলে ভালো হয়। এখানে বসেই ভয়ে ঘামছি আমি, বস্।'

'কাজটা যতো তাড়াতাড়ি পারব শেষ করব, মোস্তাক,' বলল রানা। 'আরেকবার মহড়া দিন। মনে আছে তো সব?'

'আছে। পাঁচ বার বলেছি আগে।'

'আরেকবার বলুন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল চিকা মোস্তাক। 'আপনি যখন টয়লেটে যাবেন, আমি বেরিয়ে যাব এখান থেকে। ওপেলের কাছে ফিরে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে টমিগান হাতে দরজা খুলে অপেক্ষা করব। বাতি জ্বালব না কোনও। আপনি যখন লেডি স্টানাকে নিয়ে গলির ভেতর ঢুকবেন তখন আমি গলির মুখটা কাভার করব। আপনার পিছু নেয়া না হলে রওনা হয়ে যাব আমরা। লেডি স্টানাকে আপনি

পিছনের সিটে আটকে রাখবেন, আমরা সটকে পড়ব তাকে নিয়ে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'আর আমি যদি কোনও সমস্যায় পড়ি, তা হলে? যদি পিছু নেয়া হয় আমার? এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, মোস্তাক। কোনও গোলমাল হয়ে গেলে মারা পড়ব আমরা সবাই।'

রানা মনে মনে বলল, চিকা মোস্তাকের এই মানসিক অবস্থায় তার হাতে টমিগান দিয়ে স্বস্তি পাওয়ার কোনও উপায় নেই। কিন্তু মোস্তাকের উপর ভরসা না করে আর কোনও পথও নেই। মোস্তাক ছাড়া সাহায্য করবার মতো আর কেউ নেই এখন।

'মনে আছে,' বলল মোস্তাক। 'টার্কিশ পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলিতে যাব না আমরা। তবে আর কেউ পিছু নিলে গুলি করব আমি, যদি মনে করি আপনার কোনও ক্ষতি হবে না, তা হলেই অবশ্য।'

'খুব সাবধান থাকবেন, মোস্তাক,' বলল রানা। 'আমি যদি আপনার নাম ধরে ডাকি তা হলেই শুধু গুলি শুরু করবেন। খেয়াল রাখবেন যাতে আমার গায়ে গুলি না লাগে। যদি পুলিশ বলে চিৎকার করি তা হলে আমাকে ফেলে গাড়ি নিয়ে চলে যাবেন। হাইডআউটে দেখা হবে আপনার সঙ্গে। কোনও বিপদ হলে যে যার নিজের পিঠ বাঁচাব আমরা। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ। একটা কথা।' ভোঁতা শোনাল মোস্তাকের গলা। 'কানাগলিতে গাড়ি রেখেছি আমরা। ওই গলি থেকে বের হবার কিন্তু আর কোনও পথ নেই, মিস্টার রানা। গলির সামনে থেকে বিপদ এলে আটকা পড়ে যেতে হবে।'

'এদিকের পেছনের দেয়াল টপকানো যাবে,' বলল গম্ভীর রানা। আজিজ শাহ্‌কে দোতলায় উঠতে দেখল ও। 'আমি তা হলে যাচ্ছি, মোস্তাক। এদিক প্রায় খালি হয়ে এসেছে। সিনেমা শেষ

হওয়ার আগেই কাজ শেষ করে বের হতে হবে।' উঠে দাঁড়াল রানা, কিন্তু ও পা বাড়ানোর আগেই ওর বাহুতে হাত রাখল চিকা মোস্তাক।

'এক মিনিট, বস্।'

আবার বসল রানা। 'কী, মোস্তাক?'

বারের দিকে মাথা কাত করে ইঙ্গিত করল চিকা মোস্তাক। বারটেন্ডারের সঙ্গে কথা বলছে সোনালী চুলের এক যুবতী, ওদের দিকে পিছন ফিরে আছে। চমৎকার মেয়েটার শরীরের গঠন। স্পাইক হিল পরে থাকায় তাকে স্বাভাবিকের চেয়ে লম্বা দেখাচ্ছে। পরনে কালো একটা ইভনিং ড্রেস, সুগঠিত উরু আর কোমরের কাছে টাইট হয়ে আছে। খাটো একটা মিংক জ্যাকেট পরেছে সে, চুলগুলো চুড়ো করে বাঁধা। কাঁধে ঝুলছে পেটমোটা ভ্যানিটি ব্যাগ।

'কী?' অধৈর্য হয়ে উঠছে রানা।

গলা নামাল চিকা মোস্তাক। 'মেয়েটা ডিবার্গ ম্যাকেঞ্জির প্রাইভেট সেক্রেটারি, নাম মেরিলিন হিউলেট।'

আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা। সামনে রাখা রাকির গ্লাসটা নাড়ছে ও সময় কাটাতে। আরেকবার বেপরোয়া দুঃসাহসী যুবক তুর্কি হয়ে গেছে ও, রাতটা শহরের নোংরা পল্লীতে উদ্দাম ভাবে কাটাতে এসেছে। কলারটা নেড়েচেড়ে সামনে বসা খুদে লোকটার দিকে তাকাল রানা, নিচু গলায় বলল, 'আমরা আশা করিনি এমন একটা ব্যাপার ঘটল, মোস্তাক। ঠিক এখনই মেয়েটা এখানে আসবে কেন? আরেকটা ব্যাপার, আমাকে তো আপনি জানাননি ডিবার্গ ম্যাকেঞ্জির কোনও প্রাইভেট সেক্রেটারি আছে?'

কথার ফাঁকে সোনালী চুলের মেয়েটাকে দেখছে রানা। বারের পিছন থেকে একটা ইন্টারকমে কথা বলছে বারটেন্ডার। অপেক্ষা করছে মেরিলিন হিউলেট। সোনালী একটা সিগারেট

কেস থেকে সিগারেট বের করে ধরাল মেয়েটা। ধোঁয়া টানবার ফাঁকে গুহাকৃতির ঘরের ভিতর নজর বুলাচ্ছে সে। রানা আর চিকা মোস্তাকের উপর না থেমেই সরে গেল তার দৃষ্টি। এবার বারটেন্ডার তাকে কী যেন বলল। মেয়েটা বার পাশ কাটিয়ে চলে গেল পর্দার আড়ালে।

'মেয়েটার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে কোনও অস্বাভাবিকতা পাইনি আমরা,' কৈফিয়তের সুরে বলল চিকা মোস্তাক। আরেকটা সিগারেট ধরাল সে। থরথর করে আঙুল কাঁপছে তার।

এর হাতে টমিগান আর সামনে ও নিজে, কল্পনা করে পিঠের কাছটা শিরশির করে উঠল রানার। মোস্তাক ভেঙে পড়ছে ওর চোখের সামনে। যা করবার দ্রুত করতে হবে।

'সিআইএর রিপোর্ট অনুযায়ী মেয়েটা সেন্ট লুইসের ভালো একটা পরিবার থেকে এসেছে। নিউ ইয়র্ক আর প্যারিসে আর্ট নিয়ে পড়ালেখা শেষ করেছে। তারপর প্রেমে পড়ে যায় জেমস বন্ডের বড় ভাই এক ভ্যাগাবন্ডের। লোকটা ছিল ইতালির এক নকল কাউন্ট বা এধরনের কিছু। ইস্তাম্বুলে মেয়েটাকে ছেড়ে পালিয়ে যায় সে। অবশ্য টাকার কোনও অভাব নেই মেয়েটার। ভালোবেসে ফেলে শহরটাকে, এখানেই রয়ে যায়। সময় কাটাতে চাকরি নেয় ডিবার্গ ম্যাকেঞ্জির প্রাইভেট সেক্রেটারির। আমাদের তদন্ত অনুযায়ী সিন্ডিকেটের সঙ্গে সে জড়িত নয়, শুধুই এক্সপোর্টিং কোম্পানির বিষয়ে ডিবার্গের পার্সোনাল সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করে মেয়েটা।'

চিকা মোস্তাকের দিকে তাকাল না রানা। 'অথচ দেখা যাচ্ছে, মেয়েটা এখানে এসে হাজির হয়েছে।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল চিকা মোস্তাক। মহিলার ছদ্মবেশ সত্ত্বেও তাকে দেখতে একটা হতক্লান্ত ক্লাউনের মতো লাগছে।

মনস্থির করে নিল রানা। নিচু গলায় বলল, 'যান আপনি। গাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আগের প্ল্যান অনুযায়ীই কাজ করব আমরা। তবে আমার একটু দেরি হতে পারে। সাবধান থাকবেন।'

চিকা মোস্তাক চলে যাওয়ার পর আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করল রানা। ডিবার্গের প্রাইভেট সেক্রেটারি বের হচ্ছে না। আর দেরি করা ঠিক হবে বলে মনে হলো না ওর। অনামিকার ভারী সিগনেট আংটিটা ঘোরাল ও, তালুর দিকে চলে গেল সুচটা। জিনিসটা খুদে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ। ওষুধটা মাত্র দেড় সেকেন্ডে কাজ করে, যাকে সুই ফোটানো যায় সে নেশার ঘোরে বিমোহিত হয়ে পড়ে। হাঁটতে বা কথা বলতে কোনও অসুবিধে হয় না তার। বিনা প্রশ্নে নির্দেশ পালন করে যায়। এটা ব্যবহার করেই লেডি স্টানাকে হাইডআউটে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে রানা। ওখানে নিয়ে গিয়ে ডিবার্গ ম্যাকেঞ্জি সম্বন্ধে প্রশ্ন করবে ঠিক করেছে। ডিবার্গ ম্যাকেঞ্জি থেকেই কাজ শুরু করবে ও। সিন্ডিকেটের ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য পেতে হলে ড্রাগ লর্ডদের কারও কাছ থেকে তা আদায় করতে হবে। হাতের কাছে আছে একমাত্র ডিবার্গ ম্যাকেঞ্জি। লোকটার হার্ট দুর্বল। তার মুখ খোলাতে খুব একটা অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। অবশ্য যদি তাকে নাগালে পাওয়া যায়, তবেই। আরেকটা চিন্তা দোলা দিল রানার মাথায়। চিকা মোস্তাকের কথা যদি সত্যি না হয় তা হলে মেরিলিন হিউলেটকে জিজ্ঞেসাবাদ করেও অনেক তথ্য পাওয়া সম্ভব। মেয়েটা এখনও বের হয়নি। তার জন্য আর দেরি করাটা ঠিক হবে না। সিনেমা শেষ হলে নেমে আসবে আজিজ শাহ্, লেডি স্টানাকে দেখতে যাবে সে। তার আগেই করতে হবে যা করবার। আংটিটা আরেকবার দেখল রানা, উঠে দাঁড়াল। মেরিলিন হিউলেট আর লেডি স্টানা, দু'জনকেই বিবশ করবার মতো ড্রাগ থাকবার কথা

আঙটির পেটে।

চেয়ারের উপর থেকে বিদঘুটে চেহারার সবুজ হ্যাট তুলে নিল রানা, আজ রাতের ছদ্মবেশের এটাও একটা অংশ। জিনিসটা একটা ফিডোরা। চওড়া ব্রিমের কারণে ওর চেহারা দেখা মুশকিল হয়ে পড়বে। দু'গালে আছে রাবার চিকপ্যাড। এবার মাথায় হ্যাট চাপিয়ে মনে মনে ভাবল, মেজর জেনারেল রাহাত খানও ওকে চিনতে পারতেন বলে মনে হয় না। আর চিনলেও কিছুতেই স্বীকার করতেন না তাঁর পরিচয় আছে ওর সঙ্গে।

প্রচণ্ড প্রস্রাব চাপলে মানুষ যেমন তাড়াহুড়ো করে সেই ভঙ্গিতে বারটেন্ডারের কাছে গিয়ে হাজির হলো ও। এই মুহূর্তে বার খালি। বারটেন্ডার গভীর মনোযোগে এক কপি ভ্যাতান পড়ছে।

'এরকেকলার টুভালেটি?'

পেপার থেকে চোখ তুলল না বারটেন্ডার। পর্দার দিকে মাথা কাত করে ইশারা করল। 'ডর্গু ইউরুউনায।'

'কক।'

পর্দা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা। দুর্বল একটা বাতির আবছা আলোয় দেখল একটা করিডরে আছে ও। ওপ্রান্তে একটা সাদা দেয়াল। মেঝেটা কাঠের। ফেটে গেছে জায়গায় জায়গায়। করিডরে অ্যান্টিসেপটিকের কড়া গন্ধ। করিডর ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। দ্রুত পায়ে এগোল রানা, রেস্টরুম লেখা দুটো দরজা পেরিয়ে এগিয়ে চলল নিঃশব্দে। দরজার ওপাশ থেকে প্রস্রাবের বিশ্রী, ঝাঁঝালো গন্ধ আসছে।

করিডরের শেষে চলে এলো রানা। এখানে একটা **T** তৈরি করেছে করিডর, চলে গেছে দু'দিকে। নিচু হয়ে করিডরের এদিক ওদিক তাকাল ও। কেউ নেই। বামদিকের একটা দরজার তলা দিয়ে উজ্জ্বল আলোর রেখা আসছে।

ডানদিকে আরেকটা দরজা অর্ধেক খোলা। দরজাটা বাতাসের ধাক্কায় বন্ধ হয়ে গেল। এই দরজাটাই বাছল রানা, চলে এলো ওটার সামনে। এটা পিছনের উঠানে যাওয়ার দরজা। ওখানে একটা দশফুট উঁচু দেয়াল আছে। তার পিছনে সেই পচা কাদায় মজে যাওয়া খাল। যে-দরজার তলা দিয়ে আলো আসছে ওটার দিকে আরেকবার তাকাল রানা। ঠিক করে ফেলল, আগে পিছন দিকটা ঘুরে আসবে। দু'এক মিনিট দেরি হলেও অফিসেই থাকবে লেডি স্টানা। আগে দরকার পিছন দিকের অবস্থা বুঝে নেওয়া।

বেরিয়ে পড়ল রানা রাতের আঁধারে। বৃষ্টি হচ্ছে তুমুল। সেই সঙ্গে বাতাসের ঝাপটা। আস্তরের প্রলেপ খসে যাওয়া এবড়ো-খেবড়ো একটা দেয়ালের গায়ে সেঁটে থেকে বারবার চোখ পিটপিট করল ও অন্ধকারে অভ্যস্ত হতে। আঁধারে আরেকটা ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও, নতুন করে বুঝতে পারছে তুরস্কের আবহাওয়া হঠাৎই চমক দেখায়। ও যখন বের হলো তখনও আকাশ ছিল পরিষ্কার, রাতের আকাশে অজস্র তারা মিটমিট করছিল। এখন ঘন কালো মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে সব। ক্রমেই আরও বাড়ছে বাতাস আর বৃষ্টির বেগ। হালকাভাবে কাঁধ ঝাঁকাল ও। আবহাওয়া ওর কাজে কোনও অসুবিধে করবে বলে মনে হয় না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল রানার। ওর সস্তা টাইট কোট পানিতে ভিজে আরও ছোট হতে শুরু করেছে!

অজান্তেই ওয়ালথারটা একবার ছুঁয়ে দেখল রানা। আজ রাতে অস্ত্রটা ব্যবহার না করতে হলেই খুশি হবে ও। এই অদ্ভুত মিশনটার শুরু থেকেই গোলমাল লেগে গেছে। বাড়তি ঝামেলা আরও হোক তা মোস্তাক বা ও, কেউই চায় না। এখনও জানা যায়নি কোকেন আর হেরোইনের চালানটা কোথা দিয়ে যাবে, কীভাবে সেটা ধ্বংস করা সম্ভব। সিন্ডিকেটের সদস্যদের নাম-

ঠিকানাও জানা হয়নি। সেটা জানা অত্যন্ত জরুরি, নইলে ড্রাগ কার্টেলটাকে ভেঙে দেওয়া যাবে না। মোট কথা, কাজ এগোয়নি এক কদমও। পরিস্থিতি আরও খারাপ না হলেই বাঁচোয়া।

স্টিলেটো আর সায়ানাইড গ্যাস বোমাটা স্পর্শ করল রানা। এখন অন্ধকারেও মোটামুটি দেখতে পাচ্ছে ও। চিকা মোস্তাক যেমন বলেছে উঠানটা ঠিক তেমনই, আবর্জনা ফেলার জায়গা। দেয়ালটা উঠান থেকে বের হওয়া ঠেকাচ্ছে। তবে মোস্তাকের সব কথাই ঠিক নয়। একটা সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছে ও লোহার, ওটা উঠে গেছে প্রেক্ষাগৃহে, দোতলায়। উঠান থেকে ওই পথেও বের হওয়া সম্ভব। মেরিলিন হিউলেট এখন লেডি স্টানার অফিসে আছে কি না ভাবল রানা। হয়তো বিদায় নিয়ে চলে গেছে দোতলায়। হয়তো ঠিক করেছে টয়লেটের দুর্গন্ধ সহ্য না করে এপথেই দোতলা হয়ে ফিরে যাবে। এখনই জানবার কোনও উপায় নেই। না গিয়ে থাকলে একই সঙ্গে দুই মহিলাকে সামলাতে হবে ওর।

প্যাসেজে ফিরে এলো ও, করিডর যেখানে দু'দিকে গেছে ওখান থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, প্রধান করিডর এখনও নির্জন। যে দরজা দিয়ে আলো আসছে সেটার সামনে চলে এলো ও। দরজায় অফিস কথাটা রং জ্বলে যাওয়া সোনালী হরফে স্টেনসিল করে লেখা আছে। নব ধরে মোচড় দিল রানা। ওর আঙুলের ছাপ রয়ে গেলেও কিছু যায় আসে না। খুলে গেল দরজা। ভিতরে ঢুকল রানা। আস্তে করে পিছনে বন্ধ করে দিল দরজাটা। ঘরের এক কোনায় একটা ডেস্কের উপর থেকে আলো বিলাচ্ছে একটা মাত্র বৈদ্যুতিক ল্যাম্প।

চোখে দেখবার আগেই পরিচিত গন্ধটা পেল ও। তাজা রক্ত! ভারী, একটা মিষ্টি সোঁদা গন্ধ। দরজার ল্যাচ আটকে ওয়ালথারটা কোমর থেকে বের করে হাতে নিল রানা। একটা আধখোলা দরজা

দিয়ে বাথরুমের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। ডেস্কের পাশে পড়ে থাকা গলা কাটা মহিলার দিকে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে ক্ষিপ্র চিতার মতো বাথরুমের দরজার কাছে পৌঁছে গেল ও, লাথি দিয়ে দরজা খুলেই তৈরি ওয়ালথার হাতে ঝট করে ঢুকে পড়ল ভিতরে। একটা কমোড, ওয়াশ বেসিন আর মেডিসিন চেস্ট চকচক করছে ম্লান হলদে আলোতে। কেউ নেই। অস্বাভাবিক কিছু নেই। তারপর গন্ধটা ওর নাকে এলো। দ্বিতীয়বার শুঁকল ও। গন্ধটায় ধার আছে। শুকনো তীব্র একটা গন্ধ রক্তের সোঁদা গন্ধ ছাপিয়ে উঠেছে এখানে। এক মুহূর্ত বাথরুমে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, গন্ধটা কীসের মনে করতে চেষ্টা করল। খুব পরিচিত, অথচ মনে পড়ছে না। আগেও এই গন্ধটা শুঁকেছে ও। হ্যাঁ, এসটোন!

অফিসে ফিরে এলো রানা। এবার পড়ে থাকা মৃতা মহিলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সাবধানে। ডেস্কের কাছেই চিত হয়ে পড়ে আছে লেডি স্টানা, দু'হাত দু'দিকে ছড়ানো। নিষ্পলক দৃষ্টিহীন ঘোলাটে চোখ দুটো ছাদের দিকে চেয়ে আছে। গলা আর কাঁধের কাছে রক্ত ইতিমধ্যেই জমাট বেঁধে কালো হতে শুরু করেছে। মহিলার গলাটা জোরালো একটা পোঁচে দু'ফাঁক করে দেওয়া হয়েছে। ছোট করে ছাঁটা চুলওয়ালা মাথাটা অস্বাভাবিক কোণ সৃষ্টি করে ধড়ের সঙ্গে আটকে আছে। গলা কেটে শিরদাঁড়া পর্যন্ত পৌঁছে গেছে ক্ষুরের ফলা। আরেকটু হলেই মাথাটা ধড় থেকে আলাদা হয়ে যেত।

ঘড়ির দিকে এক পলক তাকাল রানা, তারপর ওয়ালথারটা কোমরে গুঁজে রাখল। রক্ত বাঁচিয়ে মহিলার একটা কব্জি তুলে নিল। নখগুলো পরিষ্কার, কোনও নেইলপলিশ ব্যবহার করা হয়নি।

হাতটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। ভ্রূ কুঁচকে গেছে ওর। চারপাশটা দেখছে, মনে গেঁথে নিচ্ছে সব। ঝড়ের গতিতে চলছে

চিন্তা। লেডি স্টানা নেইলপলিশ ব্যবহার করেনি। কখনও করত না, মিলি জানিয়েছে। লাশটা আরেকবার দেখল ও। লেডি স্টানা আর কখনোই মুখ খুলবে না। যাতে না খুলতে পারে সে-ব্যবস্থা করে গেছে রনি রুথলেস। তার সঙ্গে কি মেরিলিন হিউলেটের পরিচয় আছে? আগেই চলে গিয়েছিল মেরিলিন হিউলেট? ও যখন পিছনের উঠানে ছিল তখন? সে চলে যাওয়ার পর আসে রনি রুথলেস?

মৃতা মহিলার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। এটা জানা জরুরি নয়। মহিলা ইংরেজ, সমাজের উঁচু তলার মানুষ ছিল এক সময়। সম্ভবত উঁচু তলার পতিতা ছিল। জরুরি না। লেসবিয়ান। ড্রাগ বিক্রির সঙ্গে জড়িত ছিল। পুলিশ সেটা জানত। কেউ তাকে ধরবার চেষ্টা করেনি। রানা এজেন্সির এজেন্টরা ভেবেছিল তার কাছ থেকে সত্যিকার মাথাদের ঠিকানা জানা যাবে। এখন আর এর কাছ থেকে সেটা জানবার কোনও উপায় নেই।

বাদামী টুইড স্কার্ট আর জ্যাকেট পরা মোটাসোটা দেহটা আবার দেখল রানা। শার্ট আর টাই পুরুষদের। কদম ছাঁট চুল। জবাই করায় চেহারায় তীব্র মৃত্যু-যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট। বিন্দুমাত্র করুণা বোধ করল না রানা। এই মহিলা মিলির মতো হাজার হাজার তরুণ-তরুণীকে ড্রাগ সরবরাহ করেছে, তাদের জীবন ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে পয়সা কামিয়েছে। অনেক তরুণ-তরুণীই আর সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে না। নেড়ি কুকুরের মতো মরতে হবে তাদের। এতো মানুষের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়েছে লেডি স্টানা যে, তার এভাবে মৃত্যু হওয়াটা অন্যায্য কিছু নয়।

ছোট্ট বাথরুমে আবার ফিরে এলো রানা। এসটোনের গন্ধটা এখনও ওকে ভাবাচ্ছে। খচখচ করছে মনটা। কেন? কারণটা ওর

জানা নেই। অনেক মেয়েই আসত নিশ্চয়ই লেডি স্টানার মনোরঞ্জনের জন্য। তাদেরই কেউ হয়তো তরলটা ব্যবহার করেছে। নাকি রনি রুথলেস মানুষ জবাই করবার আগে ক্ষুরটা জার্ম মুক্ত করে? হতে পারে। বিকৃত রুচির খুনিদের অদ্ভুত অনেক খেয়ালই থাকতে পারে।

মেডিসিন কেবিনেট খুলল রানা। এখন দ্রুত কাজ করছে ওর হাত। সময় ফুরিয়ে আসছে। যে-কোনও সময় কেউ অফিসের দরজায় ধাক্কা দিতে পারে। নীলছবি শেষ হলেই সাদাপোশাকধারী আজিজ শাহ্ লেডি স্টানাকে দেখতে আসবে। নেইলপলিশ রিমুভারটা অবশেষে খুঁজে পেল ও। লেবেলটা দেখল। ফাস্টঅ্যাক্ট। খুব দ্রুত নেইল পলিশ ওঠাতে হলে ব্যবহার করে মেয়েরা। জিনিসটা শিকাগোতে তৈরি। বোতলটা পকেটে পুরে অফিসে এসে ঢুকল রানা। এবার যাওয়ার সময় হয়েছে। লাশটা আরেকবার দেখল। ডেস্কে খুঁজে কোনও লাভ নেই। কোনও তথ্যপ্রমাণ নিশ্চয়ই রেখে যায়নি রনি রুথলেস। জরুরি কাগজপত্র নিশ্চয়ই এখানে রাখত না লেডি স্টানা। সে-তুলনায় অনেক বেশি বুদ্ধি ছিল মহিলার। তবু না খুঁজে যাওয়া চলে না।

ডেস্কের উপর কিছুই পাওয়া গেল না। প্রায় খালি বললেই চলে। একটা ব্লটার, অ্যাশট্রে, একটা টেলিফোন। এক প্যাকেট ম্যাচ। ছোট্ট কালো বাক্সটা হাতে তুলে নিল রানা। ওটার উপরে সোনালী হরফে লেখা: ডিভান অ্যানেক্স। ড্রয়ারগুলোও সব খালি।

ম্যাচটা পকেটে পুরে দরজার দিকে পা বাড়াল ও। ডিবার্গ ম্যাকেঞ্জি, মনে মনে আওড়াল রানা। অফিস আর সুইট আছে তার ডিভান অ্যানেক্সে। পুরো ফ্লোরটাই ভাড়া নিয়েছে সে। জরুরি কোনও সূত্র? হয়তো, হয়তো না। অনেকেই এরকম ম্যাচ ব্যবহার করে। হাঁটবার গতি বেড়ে গেল রানার। আগে এখান থেকে বের

হতে হবে। ভাবনা-চিন্তা পরে করলেও চলবে।

একটা ব্যাপার এখন নিশ্চিত: রনি রুথলেস আবার দেখা দিয়েছে। কঠোর হয়ে উঠল রানার চোখের দৃষ্টি। লোকটা রানা এজেন্সির চারজন দক্ষ এজেন্টকে অসহায় অবস্থায় হত্যা করেছে। খুন করেছে স্রেফ মজা পাওয়ার জন্য। মাত্রাতিরিক্ত কোকেন পুশ করায় এমনিতেই মারা যেত তারা, তাদের মৃত্যুটা আরও ত্বরান্বিত আর যন্ত্রণাদায়ক করেছে রনি রুথলেস। ও ইস্তাম্বুলে আসবার পর লোকটার উদয় হওয়াটা কাকতালীয় নয়। কোনও না কোনও ভাবে রনি রুথলেস জানে ও কে, কী করতে কেন এখানে এসেছে। ওকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে লোকটা। মনে মনে চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করল রানা, রাগে ধিকিধিকি জ্বলছে ওর বুকের ভিতরটা। ঠিক আছে, রনি রুথলেসের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হোক ওর, ও দেখবে রনি কতোটা রুথলেস। বুঝতে পারছে একা এদের বিরুদ্ধে লাগতে এসে ঠিক কাজ করেনি ও, কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারছে না। যুক্তি কাজ করছে না ওর মধ্যে। মনে বারবার জাগছে প্রতিশোধের তীব্র স্পৃহা। একটা প্রচণ্ড জেদ যেন পরিচালিত করছে ওকে।

দরজা খুলে স্বল্পালোকিত করিডরে বেরিয়ে এলো রানা। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনের আশা পূরণ হলো। করিডরের জোড়ার কাছে দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে রনি রুথলেস! পরনে ডিনার জ্যাকেট, কালো হোমবার্গ, শার্টটা চকচক করছে। পাতলা গোঁফের নীচে সরু ঠোঁটে টিটকারির হাসি। রানার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে সে, নর্তকের মতো দেহভঙ্গিমা করে রানাকে এগোতে ইশারা করল রনি রুথলেস।

অজান্তেই রানার হাত চলে গেল ওয়ালথারের বাঁটে, কিন্তু পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত পাল্টাল ও। গোলাগুলি করা ঠিক হবে না। পুলিশ হাজির হয়ে যাবে দেখতে দেখতে। তা ছাড়া এখনই রনি

রুথলেসকে খুন করবার ইচ্ছে নেই ওর। সময় আসেনি এখনও প্রতিশোধ গ্রহণের। তথ্য আদায়ের জন্যই বাঁচিয়ে রাখতে হবে লোকটাকে।

রানা বা রনি রুথলেস—দু'জনের কেউ কোনও কথা বলল না। দীর্ঘ পদক্ষেপে রনি রুথলেসের দিকে এগোল রানা, তৈরি হয়ে গেছে, এক মুহূর্তের নোটিসে হাতের তালুতে চলে আসবে স্টিলেটো। আলতো পায়ে ঘুরে গেল রনি রুথলেস, ঘুরেই সাবলীল গতিতে দৌড় দিল লাউঞ্জের দরজার দিকে। অনুসরণ করল রানা। দৌড়াচ্ছে। বাঁকটা ঘুরেই বুঝতে পারল ফাঁদে পড়ে গেছে।

বিপদটা এত কাছে যে এড়াবার উপায় নেই।

পাঁচ

দুনিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন এবং সহজ ফাঁদে পড়েছে রানা। তুমি আমাকে ধাওয়া করো, পরে আমিই নিজের সুবিধে মতো তোমাকে ধরব। রানার দুর্ভাগ্য যে ফাঁদটা কাজ করল।

বাঁক ঘুরে ছুটন্ত রনি রুথলেসের পিছু নিতে গিয়েই রানা টের পেল প্রকাণ্ডদেহী দুই তুর্কি দাঁড়িয়ে আছে ওঁৎ পেতে। একেবারে কাঁচা লোকের মতো ফাঁদটায় পড়েছে রানা। নিজেকে ক্ষমা করতে পারল না ও। আসলে রনি রুথলেসের গলা টিপে ধরবার আকাঙ্ক্ষায় আর কোনদিকে খেয়াল ছিল না ওর।

কাছের কোনায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা ছুটন্ত রানাকে পা বাড়িয়ে ল্যাং মারল। এড়াতে পারল না দৌড়রত রানা, পায়ে পা বেধে কাঠের মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পড়বার আগেই ওর জানা হয়ে গেছে শক্ত প্রতিপক্ষের পাল্লায় পড়েছে ও। পড়বার সময় ঘাড় ফেরাল ও, দেখল দ্বিতীয় লোকটা এগোতে শুরু করেছে। তার হাতে ছোট এক গোছা দড়ি। তার মানে শ্বাস আটকে ওকে মারতে চায় এরা। দ্রুত এবং নিঃশব্দে খুন করে সরে পড়বে। অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু।

দু'জন পেশাদার খুনির বিরুদ্ধে রানা একা। মেঝেতে পড়েই কাত হয়ে এক হাতে ভর দিয়ে উঠতে শুরু করল ও। দাঁড়ানোর পর ওর মনে হলো লোক দু'জন ভাবছে সহজেই কাজ সেরে ফেলতে পারবে। তবে তাদের কাজকে সহজ করে দেবার কোনও ইচ্ছে নেই রানার। কখনও প্রতিপক্ষকে ছোট করে দেখে না ও। এখনও দেখছে না। জানে, একটু ভুল করলে নির্ঘাত প্রাণটা খোয়াতে হবে এখানে।

রানাকে ব্যস্ত রাখবার জন্য প্রথম লোকটা দ্রুত পায়ে এগোল। সামনে বেড়ে এক পায়ে তার হাঁটুর পিছনটা আটকাল রানা, অন্য পায়ে লোহার হিল দিয়ে কষে লাথি মারল হাঁটুর বাটিতে। এভাবে সহজেই পা ভাঙা সম্ভব। কিন্তু এই লোকটা পিছলে সরে গেল, পরক্ষণেই পিছিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে লাথি হাঁকাল রানার পাঁজরে। ব্যথায় অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এলো রানার মুখ দিয়ে। দ্বিতীয় লোকটা দড়ি হাতে ওর গোড়ালিতে ফাঁস পরাতে চেষ্টা করছে! ঝট্ করে তার আওতার বাইরে চলে গেল ও। তার আগেই কষে লাথি মেরে দিয়েছে দড়িওয়ালার চোয়ালে। গুঙিয়ে উঠে গালি দিতে দিতে এক পাশে কাত হয়ে পড়ে গেল লোকটা। রানা এখন আন্দাজ করতে পারছে বাধ্য না হলে খুন করবার নির্দেশ দেওয়া

হয়নি এদেরকে। দড়িটা ওকে নিষ্ক্রিয় করবার জন্য। রনি রুথলেস বোধহয় কিছু প্রশ্নের জবাব জানতে চায় ওর কাছে। এই অসম লড়াইয়ের ফাঁকেও ডক্টর ফ্রাঞ্জ হার্টয আর তার সার্জিকাল ছুরির কথা চকিতে মাথায় খেলে গেল ওর। লোকটা নিশ্চয়ই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে হাতের কাজ দেখাবে বলে।

এই দু'জনের গা থেকে মাছের গন্ধ আসছে। জেলে পাড়ার মস্তান বোধহয়। দু'জনের মধ্যে আকৃতিতে বড় লোকটা গাছের গুঁড়ির মতো হাত দুটো বাড়িয়ে ডাইভ দিল ওর উপরে। রানা বুঝতে পারছে, যতোটা সহজে কাজ সেরে রোজগার করে ফেলতে পারবে ভেবেছিল ততোটা সহজ হচ্ছে না এদের কাজ। এদের চিন্তাটা পরিষ্কার পড়তে পারছে রানা। ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মেঝেতে পেড়ে ফেলে ওর নড়াচড়ার ক্ষমতা নষ্ট করতে চাইছে এরা। তারপর ওজন ব্যবহার করে ওকে আটকে রেখে আচ্ছা মতো ধোলাই দিয়ে তুলে দেবে রনি রুথলেসের হাতে।

রানার ওয়ালথারের বাঁট দেখা যাচ্ছে। ব্যাপারটাকে এরা পাত্তাই দিচ্ছে না। ভালো করেই জানে ওটা রানা ব্যবহার করবে না। এক পাশে সরে ডাইভ দেওয়া লোকটাকে এড়াল রানা, পরক্ষণেই ওয়ালথারটা বের করে ওটার সাইট দিয়ে পোঁচ মারল। ঘ্যাঁচ করে কেটে গেল লোকটার এক গাল, দরদর করে রক্ত বের হতে শুরু করল। একটা ভোঁতা আর্তচিৎকার ছেড়ে সহজাত প্রবৃত্তি বশে সরে যেতে চেষ্টা করল লোকটা। আবার সাইট ব্যবহার করল রানা তার মুখে। ক্ষতস্থান বাড়ল আরেকটা। ছিটকে এক পাশে চলে গেল লোকটা। সর্বক্ষণ দড়ি হাতে লোকটাকে চোখে চোখে রাখতে চেষ্টা করছে রানা। ওই লোকটাই আসল বিপদ ডেকে আনতে পারে।

দড়ি হাতে ওর পিছনে যাওয়ার চেষ্টা করছে দ্বিতীয় লোকটা। সুযোগ খুঁজছে ফাঁসটা গলায় পরিয়ে দেওয়ার। এক ফুট মতো

লাফিয়ে উঠল রানা, শরীরটাকে আধপাক ঘুরিয়ে দিল, তারপর সাভাট কিক মারল দড়িওয়ালার পেট লক্ষ্য করে। লাগাতে পারল না ও। মেঝেতে পা দিয়ে পিছলে গেল নিজেই। দড়িওয়ালা গলা দিয়ে নিচু স্বরে বিজয় সূচক আওয়াজ করল, দ্রুত পায়ে চলে এলো রানার কাছে, একই সঙ্গে হিসহিস করে সঙ্গীকে কী যেন বলল।

প্রায় একই সঙ্গে তিনটে কাজ করল রানা। ভারসাম্য হারিয়েছে ও, দু'জনের বিরুদ্ধে একা লড়তে হচ্ছে ওকে, আর গত চব্বিশ ঘণ্টার পরিশ্রম ওর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। ওয়ালথারটা কোমরে খোঁচা দিচ্ছে। ব্যথা লাগছে। ওটা বের করে মেঝেতে ফেলে দিল রানা, তারপর দু'পায়ে ভর দিয়ে সামলে নিয়েই ডানহাতে প্রচণ্ড ঘুসি মারল ও দড়িওয়ালার চিবুকে। হাড়ের সঙ্গে মুঠোর সংঘর্ষে কনুই পর্যন্ত ঝনঝন করে উঠল ওর। দড়িওয়ালার হাঁটু তার শরীরের ভার রাখতে অস্বীকৃতি জানাল। বিদঘুটে চেহারা করে পড়ে যেতে শুরু করল সে। জ্ঞান হারিয়েছে। ঘুরেই রানা দেখল অন্য লোকটা ওয়ালথার তুলে নিতে নিচু হয়েছে। এটাই আশা করেছিল রানা। ওয়ালথারটা ছিল টোপ। বাহুর ঝাঁকিতে ওর হাতের তালুতে চলে এলো স্টিলেটো। শক্ত করে ওটা ধরে হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিল ও। ষষ্ঠ একটা দীর্ঘ ধাতব আঙুলের মতো অপেক্ষা করছে ওর স্টিলেটো। লোকটা সময় মতো থামতে পারল না, স্টিলেটো গেঁথে গেল তার পাঁজরের কাছে। রানা সামনে থেকে সরে যাওয়ায় ওটা নিয়েই তিন-চার পা হেঁটে গেল সে। পেটের দিকে তাকাল সে থেমে। বিস্ময় নিয়ে দেখল একতাল মাখনের ভিতর গরম ছুরি যেভাবে গেঁথে যায়, সেভাবে স্টিলেটো গেঁথে আছে তার পাঁজরের নীচে। কোনাকুনি ভাবে ঢুকে ঠিক হৃৎপিণ্ডের তলাটা ফুটো করেছে স্টিলেটো।

মৃত্যুর আগে ঘুরে রানার চোখে চোখ রাখল লোকটা, এখনও চোখ থেকে বিস্ময়ের ভাবটা দূর হয়নি। তারপর বিস্ময়ের জায়গা দখল করে নিল তীক্ষ্ণ ব্যথা। চেহারা দেখে মনে হলো তার কী হচ্ছে সে বুঝতে পারছে না। মুখটা খুলে গেল। বেরিয়ে এলো জিভ। তারপরই গলগল করে রক্ত বের হয়ে ভিজে গেল চিবুক। আস্তে আস্তে কাত হয়ে পড়তে শুরু করল লোকটা। ধপ করে পড়ল কাঠের মেঝেতে।

লাশের গা থেকে স্টিলেটো বের করে তারই নোংরা শার্টে রক্ত মুছে খাপে পুরল রানা, ওয়ালথারটা সংগ্রহ করে কোমরে গুঁজল। দড়িওয়ালা এখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে দেয়ালের গা ঘেঁষে। তাকে এক পলক দেখে দৃঢ় পায়ে লাউঞ্জে বেরিয়ে এলো ও পর্দা সরিয়ে। আজিজ শাহ্‌কে লোহার সিঁড়ি বেয়ে নামতে দেখে হাঁটবার গতি বেড়ে গেল ওর। আজিজ শাহ্ লেডি স্টানার ওখানে যাবে। করিডরে ঢুকেই লাশ দেখবে সে। লেডি স্টানার অফিসে যাবে ফোন করতে। ওখানে পড়ে আছে আরেক মৃতদেহ। সঙ্গে সঙ্গে দেরি না করে স্টেশনে ফোন করবে। পুলিশ ছুটে আসবে। তার আগেই বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে। হাতে সময় খুব কম। ওপেল নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে ও আর চিকা মোস্তাক, না তার আগেই গোটা এলাকা ঘিরে ফেলবে পুলিশ? তা হলে সর্বনাশ হবে। বেআইনী ভাবে তুরস্কে ঢোকায় পুলিশের কোনও প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারবে না ও। আগামী দিনগুলো কাটবে কোনও তুর্কি জেলখানায়।

ঠিক বিশ সেকেন্ডের মাথায় লা সিনেমা ব্লিউ থেকে বেরিয়ে ভারী বৃষ্টিপাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল রানা ওপেলের দিকে। গলিটার মেঝে কোবল পাথরে বাঁধানো, টিলার দিকে কানাগলির কাছে চলে গেছে। ওখানেই অপেক্ষা করছে চিকা তার ওপেল

নিয়ে।

ওর দেরি দেখে এতোক্ষণে নিশ্চয়ই চিন্তায় পড়ে গেছে চিকা মোস্তাক। এদিকটা রাতের এই সময়ে নির্জন হয়ে যায়। পুলিশের তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রিত পতিতালয় এখান থেকে বেশ কয়েক ব্লক পশ্চিমে, লোক সমাগম যা হয় ওদিকটাতেই হয়।

টিলাটা আরও খাড়া হচ্ছে। আবর্জনাময় কোবল পাথরের সরু গলিটা আরও পিছলা হয়ে গেছে বৃষ্টিতে ভিজে। পুরোনো ইস্তাম্বুলে কেউ কিছু ফেলতে চাইলে সোজা খোলা ড্রেইনে বা গলিতে ফেলে দেয়।

একাকী দাঁড়িয়ে থাকা একটা স্ট্রিট ল্যাম্প পার হলো রানা। ভারী বর্ষণের কারণে ওটা সামান্য আলোই বিলাতে পারছে। সামনেই কানাগলি। এখনও পুলিশ আসেনি এদিকে। রাতের বাতাস চিরে দিচ্ছে না প্যাট্রল কারের সাইরেন। এতো রাত বলেই হয়তো আসতে দেরি হচ্ছে পুলিশের। ভিজে খাটো হয়ে যাওয়া কোটের ভিতর নিজেকে আঁটাবার চেষ্টা করল রানা। বরফের মতো ঠাণ্ডা বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা তীরের মতো এসে লাগছে ওর মুখে। তা-ও ভালো। মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত এই এলাকা থেকে নিরাপদেই বেরিয়ে যেতে পারবে ওরা। হাইডআউটে ফিরে গিয়ে কাপড় পাল্টে আগুনের ধারে বসবে ও হাত সেঁকতে। ভাবনাটা মনে এক ধরনের স্বস্তি এনে দিল ওর। কিন্তু স্বস্তিটা অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী হলো। মিশনটার শুরু থেকে বিপদ ঘটছে। এখনও কোনও কাজের কাজই করতে পারেনি ও। কোনও জরুরি তথ্য নেই হাতে। কবে রওনা হবে কোকেন আর হেরোইনের চালান? কোথা দিয়ে পাচার হবে? জানা নেই। অথচ সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। মূল্যবান সময়।

গলির মুখটা দানবের কালো হাঁ-এর মতো লাগছে দেখতে। চলে এসেছে রানা কানাগলির মুখের কাছে। ওটার ভিতরেই ওপেল

রেখে অপেক্ষায় আছে মোস্তাক। আরও সতর্ক হয়ে উঠল রানা। নিজের লোকের হাতে গুলি খেয়ে মরবার কোনও ইচ্ছে নেই ওর। মোস্তাক নিশ্চয়ই উত্তেজিত হয়ে আছে। সাবধানে এগোতে হবে এখন থেকে।

গলির মুখের কাছে থেমে এক ধার থেকে উঁকি দিল রানা। অন্ধকার এখানে প্রায় নিশ্ছিদ্র। আওয়াজ বলতে বৃষ্টির একটানা ঝরে যাওয়া আর নোংরা ড্রেইনে বয়ে যাওয়া পানি গড়ানোর কুলকুল শব্দ। চিকা মোস্তাক ঘুমিয়ে পড়েছে কি না একবার ভাবল রানা। বোধহয় ঘুমায়নি। কতর্ব্য সম্বন্ধে জানে মোস্তাক। তা ছাড়া অনেক বেশি নার্ভাস হয়ে আছে সে, ঘুমাতে পারবে না।

মাথা থেকে খুলে ফিডোরা হ্যাটটা গলির মধ্যে ঢোকাল রানা। নিচু কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল, 'আমি রানা! বিপদ! পুলিশ আসছে! এদিকে সব ঠিক? এক্ষুণি রওনা হতে হবে আমাদের।'

জবাব দিল না কেউ। শুধু বৃষ্টির বেগ বেড়ে যাওয়ায় ঝরঝর শব্দটাও বাড়ল।

'আমি রানা! আসছি আমি!'

এবারও সাড়া নেই কোনও।

পিঠের কাছে শিরশির করে উঠল রানার। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করছে! এই একই অনুভূতি আগেও বহুবার হয়েছে ওর। ব্যাপারটাকে ঠিক ব্যাখ্যা করা যাবে না। প্রত্যেকবার সাবধান হয়েছে বলেই এখনও বেঁচে আছে ও। কখন দ্রুত সরে যেতে হবে বা কখন স্থাণুর মতো স্থির থাকতে হবে, সেটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই বলে দেবে। এখন আগের জায়গা থেকে সরে যাওয়ার সময়। নীরব আদেশটা পালন করল রানা। বৃষ্টি-ভেজা শীতল ওয়ালথার হাতে সাবধানে দেয়াল ঘেঁষে ঢুকে পড়ল সরু গলিতে। অন্ধকারের মধ্যে ওপেলটাকে আবছা একটা চারকোনা আকৃতির মতো দেখাচ্ছে।

বৃষ্টির ফোঁটা দ্রুত লয়ে তবলা বাজাচ্ছে ওটার ধাতব ছাদে। আরও সাবধানে এগোল রানা। গাড়ির পাশে বা সামনে যাচ্ছে না ও, ওর লক্ষ্য গাড়ির পিছনের দিকটা।

কেউ কি ওঁৎ পেতে বসে আছে ওর জন্য?

নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল রানা উপুড় হয়ে, ক্রল করে কাঁচা গলির কাদার মধ্যে দিয়ে এগোল। গাড়ির পিছনে পৌঁছে ওপেলের নীচে ঢুকল ও, বুক ঘষটে এগোল গাড়ির সামনের দিকে। মাঝপথে থামল। কান পাতল। এগোল আবার। ড্রাইভারের দরজার কাছে থেমে মিশে থাকল ছায়ার মধ্যে।

কাদায় মুখ গুঁজে অপেক্ষা করছে ও। কান খাড়া। আন্দাজ করতে চেষ্টা করছে কেউ গলির মধ্যে ওর জন্য অপেক্ষায় আছে কি না। পিছনেও থাকতে পারে কেউ। নিশ্চয়ই আছে। নইলে ওর মনের মধ্যে বিপদ-ঘণ্টি বেজে উঠত না। আলো জ্বালেনি তারা। তবে আছে। কিন্তু কতোজন? কোথায় ওঁৎ পেতে আছে তারা? চিকা মোস্তাক আর ও অন্ধকারে এখানে গাড়িটা রেখে লা সিনেমা ব্লিউতে গিয়ে ঢুকেছিল। তখন গলিটা সার্চ করে দেখবার সময় বা সুযোগ হয়নি।

কাদায় শুয়ে থেকে পিছনের বাড়িগুলোর দরজা-জানালা আর বারান্দাগুলোর কথা ভাবল রানা। ওগুলোর যে-কোনওখানে সম্ভবত লুকিয়ে অপেক্ষা করছে সতর্ক মৃত্যুদূত। বিপক্ষের অবস্থান ফাঁস করাতে চাইলে একটা উপায়ই আছে, প্রতিপক্ষকে গুলি করবার সুযোগ করে দেওয়া। তার আগে জানতে হবে চিকা মোস্তাকের কী হলো। এখনই রানা আন্দাজ করতে পারছে, তবুও নিশ্চিত হতে হবে। কাজটা করতে গিয়ে নিজেকে একটা টার্গেট বানাতে হবে ওকে। খুনিকে গুলি করবার সুযোগ করে দিতে হবে। তা-ই করবে, ঠিক করল রানা।

অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে আততায়ী। হেঁটে আসবার বদলে ওর দ্রুত ক্রল করে এগিয়ে আসাটা বোধহয় অপেক্ষারত আততায়ীকে খানিকটা বিস্মিত করে দিয়েছে। কী ভেবেছে প্রতিপক্ষ ওকে? সরাসরি গাড়ির কাছে এসে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলবে ও?

সাইরেনের আওয়াজ শুনতে পেল রানা। বৃষ্টিঝরা রাতে পেত্নীর কান্নার মতো লাগছে শব্দটা। আরেকটা সাইরেন যোগ হলো প্রথমটার সঙ্গে। দুটো গাড়িই দ্রুত এগিয়ে আসছে লা সিনেমা ব্লিউর দিকে।

অনেক দেরিতে পৌঁছাচ্ছে পুলিশ, ভাবল রানা। তবে তাদের উপস্থিতি ও যেমন পছন্দ করতে পারছে না, তেমনি ওর প্রতিপক্ষও পছন্দ করতে পারবে না। যা করবার দ্রুত করতে হবে ওদের, ধরা পড়তে না চাইলে সরে পড়তে হবে এখান থেকে। কাজেই যা ঘটবার এখনই ঘটবে।

কাত হয়ে ওপেলের তলা থেকে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ বের করল রানা, হাত উঁচিয়ে ড্রাইভারের দরজার হাতল ধরে মোচড় দিল। দরজাটা বেশ খানিকটা খুলে যেতেই ভিতরে হাত ভরে দিল ও। কাপড়ের স্পর্শ টের পেল আঙুলের ডগায়। পোশাক ধরে টান দিয়ে একই সঙ্গে ওপেলের তলায় আবার ঢুকে গেল রানা। গলিতে জমে থাকা কাদাপানির ভিতর থপাস্ করে পড়ল কী যেন। হাত বাড়িয়ে ওটা স্পর্শ করল রানা, বোঝার চেষ্টা করছে। অপেক্ষা করবার সময় মেয়েদের পোশাক খুলে ফেলেছিল বেচারা মোস্তাক। তারপর তাকে হত্যা করা হয়! চকিতে একটা চিন্তা দোলা দিল রানার মাথায়। মিলি তো ড্রাগ কিনে মোস্তাকের কাছে জমা দিত। ওগুলো কী করত মোস্তাক? মোস্তাক কি ড্রাগে আসক্ত হয়ে পড়েছিল? বেশি কথা বলে বলত মোস্তাক। তার কাছ থেকেই জরুরি তথ্য পায়নি

তো কার্টেল? নইলে এতো গোপনে আসবার পরেও কীভাবে এবং কোনপথে ও আসছে সে-খবর আগেভাবে পেল কী করে তারা?

প্রায় একই সঙ্গে তিন-চারটে ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠল। বেশ খানিকটা জায়গা আলোকিত হলো। সবগুলো বাতি জ্বালানো হয়েছে গলির মুখের কাছে অথবা গলির সামনের রাস্তা থেকে। ওপেলটাকে উজ্জ্বল আলোয় গোসল করিয়ে দিল আলোগুলো। সেই আলোয় চকিতে রানা চিকা মোস্তাকের গলার কালো, চওড়া ফাঁকটা দেখতে পেল। মোস্তাকের মাথাটা বেকায়দা ভঙ্গিতে হেলে আছে। প্রায় শিড়দাঁড়া পর্যন্ত গলাটা কেটে দেওয়া হয়েছে ক্ষুর দিয়ে।

গলির পিছনের দিকে একটা দরজার কাছ থেকে টমিগান গর্জে উঠতেই দ্রুত পিছু হটে ওপেলের তলায় আশ্রয় নিল রানা। ঝাঁক ঝাঁক গুলিতে ওপেলের জানালাগুলো বিস্ফোরিত হলো। ধাতব দেহে লেগে তীক্ষ্ণ শব্দে পিছলে গেল কিছু গুলি। জবাব এলো গলির সামনে থেকে। রাস্তা থেকেও গুলি করা হচ্ছে ওপেল লক্ষ্য করে। এই সুযোগে পিছনের আততায়ীরা আগের অবস্থান পাল্টে নিয়ে গলির মুখের দিকে চলে গেল।

তাদের যাওয়া লক্ষ করেছে রানা। পিছনে আর কেউ আছে কি না জানা নেই ওর। কিন্তু ঝুঁকিটা ওকে নিতেই হবে। ক্রল করে পিছিয়ে গাড়িটার তলা থেকে বেরিয়ে পিছনের বাম্পারে বাম হাত দিয়ে আধবসা হলো রানা। ডান হাতে ওর ওয়ালথার তৈরি।

আবার গলা খাঁকারি দিল টমিগান। রাস্তার দিক থেকে গলির ভিতর গাড়িটা লক্ষ্য করে গুলি করা হচ্ছে। ঠক-ঠক করে গাড়ির ধাতব দেহে বিঁধছে বুলেটগুলো। জোঁকের মতো সেঁটে রয়ে যাচ্ছে ধাতুর গায়ে। নড়ল না রানা। পাল্টা গুলি করল না। নিজের অবস্থান ফাঁস করা এখন ঠিক হবে না। এই গাড়িটাই আপাতত ওর একমাত্র ভরসা। এই আড়াল যতোটা পারা যায় কাজে লাগাতে

হবে।

রাস্তা থেকে ট্যাট-ট্যাট-ট্যাট করে হুঙ্কার ছাড়ল একটা সাবমেশিনগান। অস্ত্রধারীর সঙ্গীরা আলো ফেলতে ব্যস্ত। আলো ওকে বিপদে ফেলে দেবে। পরপর চারবার ট্রিগার স্পর্শ করল রানার তর্জনী। দুটো বাতি নিভে গেল। ব্যথায় চিৎকার ছাড়ল এক লোক। গলির মুখের কাছে কে যেন খিস্তি আউড়াল। আওয়াজটা লক্ষ্য করে আবার গুলি করল রানা। একটা আর্তনাদ শুনতে পেল। ছপ করে ড্রেনে পড়ল কে যেন।

আবার গর্জে উঠে এক পশলা বুলেট-বৃষ্টি করল টমিগান। গাড়ির পিছন থেকে খানিকটা সরে বাতিগুলো লক্ষ্য করে গুলি করল রানা। যারা বাতির দায়িত্বে আছে তারা নার্ভাস হয়ে পড়েছে, চকিতে এদিক ওদিক আলো ফেলে খুঁজছে রানাকে।

ওয়ালথারের ম্যাগাজিন খালি হয়ে গেল। কোটের পকেটে হাত ভরে আরেকটা ক্লিপ বের করল রানা। টমিগান থামতেই পিছনে একটা পদশব্দ শুনতে পেল ও। পিছনে আরও একজন আছে!

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো আগন্তুক। তার হাতে চকচক করে উঠল স্টিল। এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা, ওর হাতে স্টিলেটো বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু লোকটা ওর দিকে আসছে না। দূর দিয়ে ওপেলটা পার হয়ে গলির মুখের দিকে চলেছে। এক হাত তুলল নিজের লোকদের জানাতে, যেন গুলি বন্ধ করা হয়। চিৎকার করে নির্দেশ দিল কে যেন। কিন্তু বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। টমিগানের একরাশ বুলেটের ধাক্কায় পলকা পুতুলের মতো কয়েক দফায় পিছিয়ে চিত হয়ে গলির ভিতর পড়ে গেল লোকটা। ছপাস করে কাদা ছিটকে এসে লাগল রানার গায়ে।

আবার সাইরেনের আওয়াজ শুনতে পেল রানা। এবার অনেক কাছে। নতুন ম্যাগাজিন ভরে নিয়ে থেমে থেমে গলির মুখ লক্ষ্য

করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল রানা। শেষ বাতিটা কারও হাত থেকে পড়ে গড়িয়ে চলে গেল ড্রেনের ভিতর, তখনও জ্বলছে। বিরতি দিয়ে গুলি করছে এখনও রানা। মোস্তাকের হত্যাকারী এবং তার সঙ্গীরা এখন চলে যাবে। পুলিশ আসছে। এবারের মতো তাদের উদ্দেশ্য পূরণ হলো না।

রানা ওয়ালথার তাক করে রাখল গলির মুখে। হঠাৎ করে নীরবতা নেমেছে, পুলিশের সাইরেনের আওয়াজ ছাড়া। তারপর কেশে উঠল একটা গাড়ির সেলফ-স্টার্টার। চালু হলো শক্তিশালী ইঞ্জিন। চাকার কর্কশ আওয়াজ তুলে রওনা হয়ে গেল গাড়িটা। কার্টেলের গানম্যানরা সরে যাচ্ছে পুলিশ আসবার আগেই।

সাইরেনের আওয়াজও থেমে গেল। এবার প্রগাঢ় নীরবতা নামল। তৃতীয়বারের মতো ওয়ালথারে গুলি ভরে বিধ্বস্ত ওপেলের পিছন থেকে বের হলো রানা। বুঝতে পারছে ঝেড়ে দৌড় দিতে হবে ওকে গলির মুখ দিয়ে বেরিয়েই। পুলিশ আসবার আগেই সরে যেতে হবে এখান থেকে যতোটা দূরে সম্ভব।

দেরি হয়ে গেছে! গোলাগুলির আওয়াজ পেয়েছে, গলির মুখের কাছে দু'দিক থেকে এসে থামল দুটো পুলিশ-কার। সাদা আলোর আভায় একজনকে ড্রেইনের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখল রানা। লাশটাকে ধুয়ে চলে যাচ্ছে বৃষ্টির নোংরা পানি। একজনকে অন্তত শেষ করতে পেরেছে ও। মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল রানা। লাশটা বেশ কিছুক্ষণ পুলিশের মনোযোগ আটকে রাখবে। ওপেল আর সামান্য দূরে পড়ে থাকা নিজের দলের গুলিতে মরা লোকটার মৃতদেহও ওর জন্য কিছুটা সময় করে দেবে। তাছাড়া মোস্তাকের লাশটা তো আছেই।

এখন প্রথম কাজ এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া। এই ফাঁদ থেকে বের হতে হবে ওকে। আগে হোক পরে হোক, নিজেদের

মধ্যে আলাপ আলোচনা বাদ দিয়ে গলিটা সার্চ করে দেখতে শুরু করবে পুলিশ। দেয়ালের গা ঘেঁষে গলির আরও ভিতরের দিকে চলল রানা। হয়তো ওদিকে বের হওয়ার কোনও পথ আছে, কিংবা হয়তো আসলেই নেই। সেক্ষেত্রে ধরা পড়ে যাবে ও। মিশনটা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। ইন্টারোগেটরের একটা প্রশ্নেরও জবাব দেওয়ার উপায় থাকবে না ওর, পালাতে পারবার আগে পর্যন্ত পচতে হবে টার্কিশ জেলে।

দ্রুত দক্ষতার সঙ্গে কাজ শুরু করল তুর্কি পুলিশ। মনে মনে প্রমাদ গুনল রানা। অত্যন্ত শক্তিশালী একটা বড় স্পট লাইট আছে পুলিশদের কাছে, ওটা জ্বেলে গলির মুখটা দিনের মতো আলোকিত করে তুলল তারা। রানার কপাল ভালো আলোটা জ্বলবার ঠিক আগের মুহূর্তে একগাদা পিচ্ছিল আবর্জনায় পা পিছলে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল রানা কাদার মধ্যে। নিথর পড়ে রইল ও বাতিটা জ্বলবার পর। থকথকে কাদার উপর গাল রেখে পড়ে আছে ও। মাটির সোঁদা গন্ধে ওর মনে হলো, এই মাটিতে কেঁচো না থেকে পারে না।

উজ্জ্বল আলোর আঙুলটা ওর চারপাশে মানুষের আকৃতি খুঁজছে।

এই প্রথমবারের মতো গায়ের কাপড়চোপড়গুলোকে মনে মনে গাল দিল না রানা। ওর ধারণা হয়েছিল শয়তানের উপাসক কোনও মহা হারামি দরজি ওগুলো বানিয়েছে, কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে লোকটার কাঁচাপাকা খোঁচাখোঁচা দাড়িওয়ালা চুপসানো গালে আদরের চুমু দিতে ইচ্ছে হলো ওর। বাদামী কোঁচকানো সুটে ময়লা-আবর্জনা মিশে একেবারে আবর্জনার মতোই রং হয়ে গেছে। দুর্দান্ত ছদ্মবেশ। কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে স্থির হয়ে থাকল রানা। ওর উপর দিয়ে সামান্যতম না থেমেই পার হয়ে গেল স্পট লাইটের

আলো। রানা এক চোখ অল্প একটু খুলে দেখল আলোটা গলির পিছনের দিকে অন্ধকার চিরছে। সেই আলোয় যা দেখল তাতে অন্তরাত্মা শুকিয়ে এলো ওর। সত্যিই এটা কানাগলি। শেষ মাথায় কয়েক ধাপ সিঁড়ি আছে। ওগুলো গিয়ে মিশেছে একটা বারান্দায়। আলোটা নিভে যাওয়ার আগে বারান্দার ওপাশে তিন-চারটে দরজা দেখতে পেল রানা।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল ও ওখানেই। পুলিশরা চিৎকার করে নির্দেশ আদান-প্রদান করছে। গুলিবিদ্ধ ওপেলের কাছে চলে এসেছে তারা এখন। একটু পরই গলিটা সার্চ করবে। কিন্তু তার আগে হাতে সামান্য সময় পাবে রানা। কিন্তু সময়টা ও কাজে লাগাবে কী করে? বের হওয়ার মাত্র একটা উপায়ই ওর মাথায় খেলছে। ওই উপায়টাই কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে হবে। পিছনে সূত্র ফেলে যেতে হবে ওকে, হয়তো নতুন করে ওকে কোণঠাসা করা হবে, কিন্তু আর কোনও পথ নেই সুযোগটা না নিয়ে। বাড়ির লোকজন ওকে এই অবস্থায় পছন্দ করুক বা না করুক, ওর কিছু করবার নেই।

দুর্গন্ধময় বর্জ্য ভরা গলিতে ক্রল করে বাড়িগুলোর দিকে এগোতে শুরু করল রানা। জমে থাকা পানিতে ওর হাত আর হাঁটু পড়ায় মৃদু ছপছপ আওয়াজ হচ্ছে। একবার মাথা নেড়ে গালে লেগে থাকা থকথকে কাদার দলা, না কী কে জানে, ঝেড়ে ফেলল ও। মনে মনে ভাবল, এখন ওর যা অবস্থা এর চেয়ে নোংরা হওয়ার উপায় নেই অন্তত কারও।

শেষ পর্যন্ত কানাগলির শেষ মাথায় সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেল ও। অন্ধকারে দাঁড়ানো নিরাপদ বুঝে দাঁড়াল ও এবার, সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল। গলির মুখের কাছেই ওপেলটাকে ঘিরে ব্যস্ত হয়ে আছে পুলিশ।

সিমেন্ট খসা একটা দেয়ালের গায়ে তিনটে দরজা দেখতে পাচ্ছে রানা। একটা জানালাও নেই। দ্রুত দরজার নব পরখ করে দেখতে শুরু করল ও। প্রথম দরজা তালা মারা।

লাথি দিয়ে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে বাসিন্দাদের পাত্তা না দিয়ে বাড়িটা পার হয়ে পরবর্তী রাস্তায় গিয়ে পড়বার কথা মাথায় এলো রানার। চিন্তাটা দূর করে দিল ও। প্রয়োজন না পড়লে ঝামেলা বাড়ানো ঠিক হবে না। পুলিশের মনোযোগ যেচে আকর্ষণ করা হবে সেক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় দরজা–তালাবন্ধ।

তৃতীয় দরজার নবের কাছে হাতটা নিতেই খুলে যেতে শুরু করল দরজাটা। ওকে দেখল এক মহিলা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'এফেন্দি! আসবে না তুমি ভেতরে? ভেতরে এসো, এফেন্দি। এসো? আমি তোমাকে সুখ দেব, শান্তিও।'

'আসছি,' পা বাড়াল রানা, বুঝতে পেরেছে কোনও স্বাধীন পতিতার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে ও। 'কিন্তু আমাকে সুখ-শান্তি দিতে হবে না। আমিই তোমাকে সুখী করে দেব। অনেক টার্কিশ পাউন্ড দেব তোমাকে। আমাকে শুধু এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একটা পথ দেখাও।'

দরজা পেরিয়ে পিছনে দরজাটা আটকে দিল রানা। দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে অভ্যেস বশে দ্রুত চোখ বুলাল ও ঘরের ভিতরে। আপাতত বিপদের কোনও কারণ দেখতে পেল না ও।

অবশ্য যদি বাড়ির মালকিনকে বিপদ না ভাবা সম্ভব হয় তবেই। মহিলা সময়-অসময়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। মহিলা বেঁটে, অসম্ভব মোটা আর পাকা চামড়ার মতো বাদামী রঙের। মাথায় নোংরা তেলতেলে চুল গিজগিজ করছে, খানিকটা জট ধরেছে তাতে। নাকটা চার টাকা দামের রসগোল্লা আকৃতির।

চেহারায় এখানে ওখানে বেশ কয়েকটা বড় বড় কিশমিশ আকৃতির কালো আঁচিল লটকে আছে। ছোট ছোট কালো চোখ দুটোতে উজ্জ্বল দৃষ্টি। রানার দিকে প্রশংসা ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে। রানা মনে মনে শিউরে উঠে ভাবল, এ নিশ্চয়ই স্বাধীন ভাবে পতিতাবৃত্তি করে। শহরের পতিতালয়ের মান রক্ষা করতে চাইলে সুস্থ মস্তিষ্কের কোনও পুলিশ ডিপার্টমেন্ট একে পতিতালয়ে বসবাসের লাইসেন্স দেবে না।

হাসল মহিলা। রানা লক্ষ করল সামনের দু'পাটি দাঁতের একটাও নেই মহিলার, কালচে মাড়ি দেখা যাচ্ছে শুধু। রানার দিকে এগিয়ে এলো মহিলা হাত বাড়িয়ে। 'বক্‌শিশ্‌!'

পকেটে রাখা পুরু বান্ডিল দেখতে না দিয়ে বেশ কয়েকটা পাউন্ড বের করে মহিলার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। ওর চোখ ঘরে আরেকটা দরজা খুঁজছে। কোনও দরজা নেই। ভারী পর্দা ঝোলানো একটা জানালা অবশ্য আছে। ওটার কাছে চলে গেল রানা, পর্দা সরিয়ে জানালার পাল্লা খুলে ফেলল। ভয়াবহ একটা পচা দুর্গন্ধে ভরে উঠল ঘরটা।

আজ রাতে এই প্রথম নয়, ভাগ্য বিপর্যয়ে খানিকটা মুষড়ে পড়ল রানা। বিড়বিড় করে কপালকে দোষ দিল ও। ফিরে মহিলার মুখোমুখি হলো। ফোকলা হাসল মহিলা, কাপড় খুলতে শুরু করেছে।

এক হাত উপরে তুলল রানা। 'ইয়োক!'

ইতিমধ্যেই ব্লাউজ খুলে ফেলেছে মহিলা। বড় দুটো চোপসানো বেলুনের মতো স্তন দেখে ক্ষণিকের জন্য অসুস্থ বোধ করল রানা। জানালা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল ওটাই এখান থেকে বের হওয়ার একমাত্র পথ কি না।

ঘনঘন মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিল মহিলা। জানাল

ওখানে নীচে পচা পাঁক ভরা একটা খাল আছে, সোজা হর্নে গিয়ে পড়েছে। মহিলাকে দেখতে বিভ্রান্ত লাগল। কাদাভরা খালের ব্যাপারে এফেন্দি এতো উৎসাহী কেন তা তার মাথায় ঢুকছে না।

'থ্যাঙ্ক ইউ,' মহিলাকে বলল রানা। 'তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ। অন্তত স্বাধীনতা তো রক্ষা করেছ বটেই। গুডবাই!'

দেরি না করে জানালা টপকে ওপাশে পড়তে শুরু করল রানা। থকথকে কাদা ভরা খালটা বেশ নীচে, কিন্তু ব্যথা পাবে না জানে ও। খুব নরম জিনিসে পড়বে ও, যদি চোখা কিছু না থাকে!

অবাক হয়ে রানার কাণ্ড দেখল পতিতা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার ব্লাউজ পরতে শুরু করল। পাগল এফেন্দি যা খুশি করুক, তাকে এফেন্দি যথেষ্টরও বেশি টাকা দিয়ে গেছে।

পাগল এফেন্দি বিশ ফুট নীচে ফ্রেঞ্চরা যাকে বলে মার্ডে, সেখানে গিয়ে পড়ল। মার্ডে শব্দটা শুনতে অনেকটা মার্ডারের মতো। থ্যাপ করে কাদায় পড়ে রানা মনে মনে বলল, 'সত্যিই মার্ডার হয়ে গেলাম! অন্তত তিনটে সাবান শেষ করার আগে নিজেকে আর মানুষ বলে ভাবতে পারব না আমি।'

ছয়

ইস্তাম্বুলের হোটেল হিলটনের কোনও কোনও সুইট থেকে দক্ষিণের ট্যাক্সিম স্কয়্যারের বাগান দেখা যায়। বিশেষ করে গাছগুলোর

পাতা পুরোপুরি না গজালে দৃশ্যটা খুব পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। আর কারও কাছে যদি শক্তিশালী বিনকিউলার থাকে তা হলে তার জন্য দেখাটা আরও অনেক বেশি সহজ।

আমেরিকার ইন্ডিয়ানা স্টেটের ইন্ডিয়ানাপোলিসের বাসিন্দা মিস্টার হার্বার্ট থমসনের কাছে শক্তিশালী বিনকিউলারই আছে। জার্মানির তৈরি বিনকিউলার। অত্যন্ত শক্তিশালী এবং দুনিয়ার সেরা। মিস্টার থমসন এখন বসে আছেন তাঁর সান-ব্যালকনিতে, বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে দক্ষিণ দিকটা দেখছেন। লাঞ্চ আওয়ারে সুন্দরী তরুণী সেক্রেটারি আর শপগার্লরা বাগানে বিচরণ করছে, কিন্তু সেদিকে তাঁর বিশেষ কোনও আগ্রহ আছে বলে মনে হচ্ছে না। ডিভান অ্যানেক্সটা বিশেষ মনোযোগে দেখছেন তিনি। একদম নতুন অ্যাপার্টমেন্ট ভবন ওটা। সুপ্রাচীন ও প্রসিদ্ধ ডিভান হোটেলের প্রায় গা ঘেঁষে তৈরি করা হয়েছে অ্যানেক্স বিল্ডিংটা।

কিছুটা তিক্ততার সঙ্গে ভাবছেন মিস্টার থমসন, অ্যানেক্স বিল্ডিংটা মূল হোটেলের চেয়ে খানিকটা খাটো করে বানানো হলেই ভালো হতো। অথচ ওটা হোটেলটার চেয়ে দশ ফুট উঁচু! এই উচ্চতা সমস্যা ডেকে আনবে। ইতিমধ্যেই মিস্টার থমসনের জানা হয়ে গেছে সবার মনোযোগ আকর্ষণ না করে স্বাভাবিক কোনও উপায়ে ডিবার্গ এক্সপোর্টিং কোম্পানি লিমিটেডের অফিসে ঢোকা অসম্ভব। কিন্তু মিস্টার থমসন কারও মনোযোগ কাড়তে চান না। একেবারেই না।

ডিবার্গ লিমিটেডের সিকিউরিটি খুব কড়া। বোধহয় একটু বেশিই কড়া। ডিবার্গ লিমিটেডেরই অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ডিবার্গ সিকিউরিটিজের মিলিটারি ট্রেইনিং পাওয়া সশস্ত্র প্রহরীরা অফিসটা সর্বক্ষণ পাহারা দেয়। অফিসে ঢুকতে হলে বিশেষ পাস থাকতে হয়। অজুহাত হিসেবে বলা হয় অফিসে প্রচুর টাকা মজুদ রাখা হয়

বলেই এই বাড়তি সতর্কতা।

হয়তো কথাটা সত্যি, ভাবলেন মিস্টার থমসন। অথবা হয়তো অন্য কারণ আছে এতো কড়া প্রহরার।

মোটাসোটা শরীরটা নেড়েচেড়ে বসলেন মিস্টার থমসন। খেয়াল করেছেন আজকে ডিবার্গ লিমিটেডের সিকিউরিটি দ্বিগুণ করা হয়েছে। টপ ফ্লোরের প্রধান করিডর বিনকিউলার দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন তিনি। নীচে তো গার্ডরা আছেই, আজকে করিডরেও দু'জন ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র গার্ড পাহারা দিচ্ছে। মিস্টার থমসন আগে শুনেছিলেন একজন গার্ড পাহারা দেয়। মৃদু হাসলেন মিস্টার থমসন। বিশেষ কারও জন্য কি ফাঁদ পাতা হচ্ছে ডিবার্গ এক্সপোর্টিঙের অফিসে? এতো সতর্কতা কীসের? সফল আর সব অভিজাত প্রৌঢ়ের মতোই প্রশান্ত হাসলেন তিনি। ডিবার্গ লিমিটেডের জন্য খবর আছে তাঁর কাছে। পানি শীঘ্রি খুব ঘোলা হয়ে উঠবে।

অ্যানেক্সের দিক থেকে হোটেল ডিভানের অপেক্ষাকৃত খাটো দালানের ছাদে বিনকিউলার তাক করলেন তিনি। দুটো বিল্ডিঙের মধ্যেকার দূরত্ব বড়জোর পনেরো ফিট। ফাঁকটা পার হওয়া অসম্ভব নয়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন মিস্টার থমসন। তাঁর যখন তারুণ্য ছিল তখন তিনি প্রায় ওই সমান দূরত্ব এক লাফে পার হয়েছেন, তিনি যে স্কুলে পড়েছেন সেখানে তাঁর রেকর্ড আজও বলবৎ আছে। কিন্তু এই পনেরো ফিট পার হওয়া সম্ভব নয় কিছুতেই। নয়তলা নীচে খসে পড়তে হবে চেষ্টা করতে গেলে। অ্যানেক্সটা দশ ফিট উঁচু হওয়াটা দূরত্বটুকু পার হওয়ার পথে বিরাট একটা অন্তরায়।

আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা সিগার ধরালেন মিস্টার থমসন। গোল একটা তেলতেলে করোনা সিগার ওটা। লবিতে

কিনতে গেলে একেকটার দাম পড়ে ছয় ডলার করে। গোল মোটা সিগার মোটেই পছন্দ নয় তাঁর, অথচ এটাই খেতে হবে। ইন্ডিয়ানাপোলিসের হার্বার্ট থমসন এই জিনিসই টানেন। ধোঁয়া গিলে মুখটা বিকৃত হয়ে গেল আমাদের হার্বার্ট থমসনের। স্বল্প মায়োপিক চোখে বিনকিউলার তুললেন তিনি আবার। মাঝেমধ্যে দু'এক ফোঁটা বিশেষ তরল দিয়ে তিনি মায়োপিক সেটা বুঝিয়ে থাকেন। মানুষকে বিভ্রান্ত করতে বাকিটা করে তাঁর চশমার ভারী, পাওয়ারবিহীন কাঁচ।

পুরোনো ডিভান হোটেলের ছাদে কিছু একটা নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে। কোনও পেন্টহাউস? তার জন্য যথেষ্ট জায়গা বোধহয় নেই। এমনিতেই ছাদে বাচ্চাদের প্লেগ্রাউন্ড আর একটা সুইমিং পুল আছে। চেহারা কুঁচকে ধোঁয়া গিলবার ফাঁকে মিস্টার থমসন ওখানে ব্যস্ততা লক্ষ করছেন। কাঠ মিস্ত্রীরা হাতুড়ি ঠুকছে, তক্তা কাটছে, এখানে ওখানে তক্তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের সামনে থেকে বাচ্চাদের সরিয়ে রাখতে ব্যস্ত হয়ে আছে বাচ্চাদের মা আর আয়ারা। বাচ্চাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুল, সুইং আর ট্র্যামপোলিনের দিকে।

একটা বাচ্চা অবাধ্য হওয়ায় পাছায় চড় খেল আয়ার। মুচকি হাসলেন মিস্টার থমসন। বাচ্চারা বিপজ্জনক কাজে অত্যন্ত উৎসাহী হয়। আসলে বিপদের মাত্রা নিজের আয়ত্তের মধ্যে মনে করলে বিপদ মোকাবিলা করতে কে না চায়।

এই মুহূর্তে মোটাসোটা লালমুখো মিস্টার থমসনকে যেন প্রৌঢ় মনে হচ্ছে না। কেউ দেখলে হয়তো কবি বায়রনের সেই উক্তিটা তার মনে পড়ে যেত: প্রতিটি মোটা মানুষের ভিতর থেকে একজন সুদেহী মানুষ ছিটকে বেরিয়ে আসতে উদ্গ্রীব হয়ে থাকে।

সুইটের কোথায় যেন একটা দরজা খুলে আবার বন্ধ হলো।

মিস্টার থমসন কান পাতলেন। সুইটের ভিতর তুর্কি গান বাজছে। গানের সঙ্গে গুনগুন করছে নারী কোকিল-কণ্ঠ। একটা দরজা খুলে আবার বন্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলেন মিস্টার থমসন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'মিলি ডার্লিং?'

'হ্যাঁ, ডার্লিং?'

'তোমার বুড়ো প্রেমিককে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দেবে, প্লিজ?'

'আসছি। এক মিনিট।'

মিস্টার থমসন একবার মুখ কুঁচকালেন, তারপর আগের সেই নির্বিকার নিস্পৃহ চেহারা করে বসে থাকলেন সান-ব্যালকনিতে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়েছে ইস্তাম্বুলে একমাত্র তাঁর কাছেই ফিল্ডগ্লাস নেই। তবে এই মুহূর্তে তাঁদের উপর কেউ নজরে রাখছে বলে মনে হয় না। অন্তত এখনও নয়। কিন্তু মিস্টার থমসন অত্যন্ত সতর্ক মানুষ, নইলে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় এতো ভালো কখনোই করতে পারতেন না।

আসলে মিস্টার থমসন কখনও রিয়েল এস্টেটে পয়সা করতে পারেননি, এবং তিনি সত্যিই মিস্টার থমসন নন সেটা এমুহূর্তে বড় কোনও ব্যাপার নয়। মাসুদ রানা যখন কারও ছদ্মপরিচয় ব্যবহার করে তখন হুবহু আসল লোকটাকে নকল করবার চেষ্টা করে। তার স্বভাব, অভ্যেস, আচরণ, ভঙ্গিমা, দোষ-গুণ সব মাথায় রেখে সেই চরিত্রে মিশে যায়। নিয়মই হচ্ছে: যখন তুমি কারও ছদ্মবেশ নাও, নিজেকে বিশ্বাস করাও তুমিই সে, তা হলেই নিখুঁত ভাবে নকল করতে পারবে। নিয়মটার সুবিধে-অসুবিধে দুটোই আছে।

অসুবিধেটা রানা অন্তরে বোধ করল মিলি গঞ্জালেস পানির গ্লাস নিয়ে ব্যালকনিতে ওর পাশে এসে দাঁড়ানোয়। মিলি একেবারেই বদলে গেছে, সেই আগের মিলি আর নেই। হালকা সবুজ একটা নিট ওর পরনে। পোশাকটা ওর চমৎকার দেহের প্রতিটা রমণীয়

বাঁক জাপটে ধরে আছে, ফিগারের আকর্ষণ পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলেছে। পায়ে হাইহিল ওর, সুগঠিত ঊরু আর গোড়ালিকে নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছে যেন। সরু একটা পাতলা ব্লাউজ পরেছে মিলি, ওটার বাধা মানতে চাইছে না কোমল স্তন যুগল। কোমর পর্যন্ত কালো দীর্ঘ চুল সূর্যের আলোয় বার্নিশ করা আবলুশ কাঠের মতো চিকচিক করছে। কমলার কোয়ার মতো লোভনীয় অধরে সাবধানে লিপস্টিক বুলিয়েছে মিলি। মুখে হালকা মেকআপ। লাজুক আয়ত বাদামী চোখের মায়াবী দৃষ্টি নীরব আহ্বানে ডাকছে রানাকে।

পানির গ্লাসটা রানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আর্মচেয়ারের হাতলে বসল মিলি। ঝুঁকে রানার টাকে চুমু খেয়ে বলল, 'পরচুলাটার স্বাদ ভালো নয় মোটেই। আর কতোক্ষণ এরকম অভিনয় করে যাব আমরা, রানা?' গলা নিচু করে রেখেছে মিলি, প্রায় ফিসফিস করছে।

'যতোক্ষণ প্রয়োজন,' বলল রানা। খানিকটা কঠোরতা থাকল ওর কণ্ঠে। 'তোমাকে তো বলেছি অভিনয় করতে হবে। এমনকী আমরা যখন একা তখনও। নইলে ভুল হয়ে যেতে পারে যে-কোনও সময়। আমরা নিশ্চিত নই যে আমরা সত্যিই একা। ছারপোকা থাকতে পারে ঘরে।'

'আমি দুঃখিত, ডার্লিং। ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি তো খুঁজে দেখেছ, কোনও আড়ি পাতার যন্ত্র নেই। আমি ভেবেছিলাম...'

'এখন থেকে ইচ্ছে মতো কিছু ভেবে নিয়ো না। আমরা যা করছি সেটা স্রেফ ছেলেখেলা নয়, মনে রেখো। যদি কখনও মনে হয় আমরা ছেলেমি করছি তা হলে শুধু মোস্তাকের কথা স্মরণ কোরো।'

মিলির মিষ্টি চেহারায় গাঢ় একটা ছায়া খেলে গেল। 'বেচারা মিস্টার মোস্তাক। কী যে খারাপ লেগেছে আমার! আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন উনি, আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, নইলে হয়তো এখন কবরে পচত আমার লাশ। আর উনি...' ফুঁপিয়ে উঠতে গিয়েও সামলে নিল মিলি। সামান্য বিরতি দিয়ে বলল, 'তবে তুমি সঙ্গে থাকলে কেন যেন অতোটা ভয় করে না।'

আলতো করে মিলির হাত ধরল রানা। 'কর্তব্য পালন করতে গিয়ে মারা গেছে মোস্তাক। ওর মৃত্যুটা সম্মানের। বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে আমাদের। কাজটা কঠিন। যেভাবে বলি সেভাবে চোলো এখন থেকে, তা হলে আমার পক্ষে দায়িত্ব পালন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল মিলি। 'চলো, ঘরে যাই।'

উঠল রানা, ভারী নিতম্ব দুলিয়ে রওনা হলো মিলির পিছনে। ওর লিনেনের ট্রাউজার পিছনের দিকে কুঁচকে গেছে। প্যান্টে না গুঁজে পরেছে ও বিরাট একটা সাদা স্পোর্টস শার্ট। সাদা-কালো জুতোজোড়া বিশেষ ভাবে ফোলানো। মধ্যবয়সী এক ব্যবসায়ী রানা, বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কাছে ফিরে যাওয়ার আগে চুটিয়ে ফুর্তি করছে কমবয়সী এক প্রেমিকার সঙ্গে। আজই সকাল দশটার পর হিলটনে চেক ইন করেছে সে।

তৃপ্তির সঙ্গে রাবারের তৈরি পেটে চাপড় মারল রানা, মিলির পিছু নিয়ে চলে এলো লিভিং রুমে। সোফায় বসল ও। অন্য ঘরে চলে গেল মিলি।

এই ছদ্মবেশ নিয়ে বেশিক্ষণ নিরাপদ থাকতে পারবে না বুঝতে পারছে রানা। ড্রাগ কার্টেল সে তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী আর চতুর। কিন্তু আপাতত কাজ চলে যাবে। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময় দরকার ওর। তা হলেই ওর উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

প্রথমে রানা মিলিকে এসবের মধ্যে জড়াতে চায়নি। ভেবেছিল মিলিকেও হাইডআউটে রেখে আসবে, কিন্তু মিলি কিছুতেই রাজি হয়নি, জোর দিয়ে বলেছে, রানা এজেন্সির আর কেউ বেঁচে না থাকায় তার অন্তত রানার সঙ্গে থাকা উচিত। প্রয়োজনে ব্যাকআপ হিসেবে কাজ করতে পারবে সে। রানা আপত্তি করায় জানিয়েছে রানা এজেন্সিতে কাজে যোগ দেওয়ার পর সংক্ষিপ্ত ট্রেইনিং নিয়েছে ও আন-আর্মড কমব্যাট আর হালকা অস্ত্র চালনায়। রানা তারপরও রাজি হচ্ছে না দেখে বলেছে ওর ধারণা রানা পাশে থাকলে কেউ কিছু করতে পারবে না ওর। কিছুতেই মিলি ছাড়বে না বুঝবার পর একরকম বাধ্য হয়েই ওকে সঙ্গে রেখেছে রানা। ওকে সঙ্গে না রেখে আসলে কোনও উপায়ও দেখেনি রানা। সালমান রাশেদি আস্তানা পাহারা দিচ্ছে। ওখানে ওই সমাধিক্ষেত্রের তলায় মিলি বোবা মানুষটার সঙ্গে একা থাকতে পারবে না জানিয়ে দিয়েছে। বাধ্য হয়েই মিলিকে রাখতে হয়েছে সঙ্গিনী হিসেবে। তা ছাড়া, যে কাভার ও তৈরি করেছে তাতে একজন সঙ্গিনী সত্যিই দরকারও ছিল ওর। ভেবেচিন্তে আর আপত্তি করেনি রানা।

'পছন্দ হয়?' পাশের ঘর থেকে একটা নীল গাউন পরে এসে দুষ্টু হাসল মিলি রানার দিকে চেয়ে।

চুপ করে থাকল রানা, নিজের চিন্তায় মগ্ন। আবার চলে গেল মিলি, কিছুক্ষণ পর দুটো কোকের ক্যান নিয়ে ওর পাশে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। একটা রানাকে দিয়ে নরম গলায় বলল, 'সর্বনাশা ড্রাগ আমাকে শেষ করে দিয়েছিল। তারপর এক সময় ছাড়তে চাইলাম। অথচ মিস্টার মোস্তাক...'

'খুব কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই?' হর্নের দিক থেকে চোখ না সরিয়েই জিজ্ঞেস করল রানা। মেয়েটার প্রতি মমতা অনুভব করছে ও। আগের কথার খেই ধরে বলল, 'আগে একবার মোস্তাকের ব্যাপারে

কী যেন বলতে গিয়েও বলোনি তুমি। কী বলতে চেয়েছিলে? মোস্তাক কি ড্রাগে অ্যাডিক্ট হয়ে পড়েছিল?’

একটু দ্বিধা করল মিলি। ‘আমার তা-ই ধারণা। মেরিলিন হিউলেটের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁর। তা ছাড়া কখনও উনি আমাকে জানাননি আমার কেনা ড্রাগগুলো নিয়ে কী করেন তিনি। তাঁর হাতে আর কাঁধে সিরিঞ্জের দাগ দেখে ফেলেছি আমি একদিন। অথচ তাঁকে কোনও ড্রাগ জয়েন্টে যেতে হতো না যে ড্রাগ নেবার ভান করতে হবে।’

‘ড্রাগ ছাড়ার ব্যাপারে বলো। খুব কষ্ট হয়েছিল?’ মোস্তাকের চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে দিতে চাইল রানা। ওরও মনে পড়ল আড়মোড়া ভাঙবার সময় তার হাতে যেন সিরিঞ্জের দাগ দেখেছিল ও। তখন ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি ব্যাপারটা। ভাবতেও পারেনি মোস্তাক এতো বড় বোকামি করতে পারে।

‘কষ্ট তো হয়েছেই,’ রানার চওড়া কাঁধে মাথা রাখল মিলি। ‘তবে সাহায্য পেয়েছি অনেক। মিস্টার মোস্তাক সাহায্য করেছিলেন। আমাকে তিনি আরোগ্য নিকেতনে ভর্তি করান। ওটা বাংলাদেশী কিওর ক্লিনিক। তাঁর সহায়তা পেয়ে ড্রাগ ছাড়াটা যতো কঠিন হওয়ার কথা ততো কঠিন মনে হয়নি। ডাক্তাররাও অনেক সাহায্য করেছেন, সাহস দিয়েছেন। মিস্টার মোস্তাক আর তাঁদের কাছে আমি ঋণী। কোনও দিন তাঁদের ঋণ আমি শোধ করতে পারব না। ড্রাগ ছাড়ার পর বাড়ি ফিরে যেতে পারিনি লজ্জায়। মিস্টার মোস্তাক আমাকে প্রথমে রানা এজেন্সিতে ইনফর্মারের চাকরি দেন, পরে এজেন্ট করে নেন। তখনও আমি ড্রাগ কিনতাম তাঁর পরামর্শে, জয়েন্টগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করতাম। যারা বিক্রি করত তারা ভুলেও ভাবতে পারেনি আসলে আমি ওগুলো কিনে মিস্টার মোস্তাককে দিয়ে দিই।’

মনোযোগ দিয়ে শুনছে রানা, গড়গড় করে নিজের কথা বলে যাচ্ছে মিলি। রানার চোখ ডিভান হোটেলের ছাদে। অ্যানেক্স বিল্ডিং আর হোটেলের জানালাগুলোর কাঁচ সূর্যের আলোয় সোনালী দেখাচ্ছে। ওখানে ছাদের সুইমিং পুলে উঁচু বোর্ড থেকে ডাইভ দিচ্ছে অনেকে। বাচ্চারা খেলায় ব্যস্ত। ট্র্যামপোলিনে লাফাচ্ছে। বিদ্যুৎ-চমকের মতো চিন্তাটা খেলে গেল রানার মাথায়। ডাইভিং বোর্ড! ট্র্যামপোলিন! কাজ হতে পারে! হয়তো কাজ হবে! ঝুঁকিপূর্ণ হলেও এখন সম্ভব বলেই মনে হচ্ছে!

'রানা?' ডাকল মিলি। 'কোথায় হারালে?'

ঘুরে তাকাল রানা, মিলির চোখে চোখ রাখল। 'আজ রাতে আমি কাজে বের হবো।'

হাত ধরাধরি করে লিভিং রুমে ফিরে এলো রানা আর মিলি। মিলি যেন কী বলতে চায়, মুখ ফুটে বলতে পারছে না।

লাঞ্চ আনিয়ে সুইটেই খাওয়া সারল ওরা। বয়কে দিয়ে পেপার আনাল রানা। প্রত্যেকটা পেপারে এসেছে চিকা মোস্তাকের মৃত্যুসংবাদ, তবে একটাতে আছে অটোপসি রিপোর্ট। তাতে বলা হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে কোকেনে আসক্ত ছিল সে। ওর সন্দেহই সঠিক জেনে মনটা আরও বিষণ্ন হয়ে গেল রানার।

দুপুরের পর শুলো রানা। কিছুক্ষণ পর ওর মাথার পাশে এসে বসল মিলি, চুলে বিলি কেটে দিতে শুরু করল। টুকটাক কথা হলো ওদের মাঝে, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

বিকেলে কপালে নরম ঠোঁটের স্পর্শে চোখ মেলল রানা। তখনও মিলি ওর মাথার পাশে বসে চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

'ব্যাপারটা কী হলো, মিলি?'

'আমি আমার ভূমিকা পালন করছি মাত্র,' মুচকি হেসে বলল মিলি।

‘সেটা তো করবে লোকের সামনে।’

‘তুমি না বললে, ঘরে-বাইরে সব সময় নিজের ভূমিকা পালন করতে হবে, তবেই সার্থক অভিনেত্রী হতে পারব!’

চোখে চোখে কথা হলো দুজনের। হাসল রানা, আর কিছু বলল না। আগুনে পুড়তে চায় যে মেয়ে, তাকে বুঝিয়ে কী লাভ?

সন্ধ্যায় কিছুক্ষণের জন্য হোটেল থেকে বের হলো রানা। এক দোকান থেকে দড়ি আর অন্য দোকান থেকে হুক কিনে ফিরল।

সুইটে ঢুকেই শুনল নাচের বাজনা বাজছে। নীল জামা পরা মিলি পরীর মতো নাচছে বাজনার সঙ্গে। রানাকে দেখে ওর মুখটা আরক্ত হলো। নাচতে নাচতেই রানার সামনে এসে দুহাতে জড়িয়ে ধরল ওকে। ভূমিকা পালন করছে। ভেজা ভেজা ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হলো। পায়ের পাতার সামনের অংশে ভর দিয়ে আলতো করে রানার ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াল মিলি। অল্প অল্প কাঁপছে ওর দেহ।

রক্তে কীসের এক অজানা শিহরন অনুভব করল রানা। ওর নিষ্ঠুর ঠোঁট চেপে বসল মিলির কোমল অধরে। নীরব সমঝোতায় অন্ধকার বেডরুমের দিকে চলল ওরা একটু একটু করে।

‘পরে পস্তাবে না তো, মিলি?’ ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

‘কেন? আমি তো তোমার কথামত অভিনয় করছি,’ দুষ্টামি হাসি মিলির ঠোঁটে। ‘প্রেমিকার আচরণ করতে হবে না?’

‘না করলেও চলে কিন্তু।’ খাটের উপর বসল রানা।

‘তা ছাড়া ভাবছি, আমাকে যেভাবে পরীক্ষা করে দেখেছ ড্রাগ নিচ্ছি কি না, তোমাকেও আমার সেই একই ভাবে পরীক্ষা করে জেনে নেয়া দরকার তুমিও নিচ্ছ কি না।’ একটা পেন্সিল টর্চ রানার দিকে তাক করে, শান্ত গলায় বলল মিলি, ‘ভয় পেয়ো না, আমি

তোমার কোনও ক্ষতি করব না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাজটা করতে হচ্ছে। তোমার পোশাক খুলে ফেলো।'

'কীহ্!'

'একবারই মাত্র ব্যাখ্যা করব আমি, রানা,' বলল মিলি। 'তারপর যদি তুমি কথা না শোনো তা হলে জোর করে তোমার কাপড় খুলতে হবে আমাকে! নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, তোমার কথা অন্ধের মতো বিশ্বাস করতে পারি না আমি? এবার পোশাক খুলে ফেলো। আমি দেখতে চাই তোমার শরীরে সিরিঞ্জের নতুন কোনও দাগ আছে কি না। ভেবো না আনন্দ পাবার জন্য কাজটা করছি আমি, করতে হচ্ছে এটা আমার দায়িত্ব বলে।'

'ইয়োক!' বলল রানা।

'করতেই হবে, রানা, দেরি কোরো না। আমি তা হলে বাধ্য হবো কাজটা নিজ হাতে করতে।'

'ঠিক আছে, লজ্জা-শরম বলে কিছু যদি না থাকে, তা হলে নিজ হাতেই করো। আমি পারব না।'

রানার কাপড় আর প্যাডিং খুলে ফেলল মিলি দক্ষ হাতে।

'গুড!' এক পা পিছিয়ে টর্চের আলো রানার দেহে ফেলল মিলি। আপাদমস্তক পরীক্ষার ভান করছে।

ভ্রূ কুঁচকে রেখেছে রানা। 'সারাজীবন এজন্যে তোমাকে ঘৃণা করব আমি, মিলি,' হিসহিস করে বলল ও। 'সারাজীবন! যদি অনেক বছর বাঁচি তো অনেক বছর ধরে তোমাকে আমি...'

'চুপ!' ধমক দিল মিলি।

দু'চোখ ভরা ঘৃণা নিয়ে মিলিকে দেখল রানা। 'নোংরা মনের মেয়েমানুষ তুমি, মিলি গঞ্জালেস! তুমি ছেলেদের উলঙ্গ দেখে বিকৃত আনন্দ পাও।'

জবাব না দিয়ে ব্যস্ত হাতে এবার নিজের ব্লাউজের বোতাম

খুলল মিলি, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ব্লাউজটা খুলে ফেলল। ধীর পায়ে এগিয়ে এলো রানার দিকে।

'ইয়োক!' রানা আপত্তি জানাল।

কিন্তু কথা শুনল না মেয়েটা। দু'হাত পিঠের পিছনে নিয়ে ব্রেসিয়ারের হুক খুলল ও, তারপর ওটা খুলে মাটিতে ফেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার বুকে।

গ্রীষ্মের প্রখর খরতাপ শেষে এক সময় নামল বর্ষার ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, কেঁপে কেঁপে উঠল মিলি, তারপর রানার বুকে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ল বেখবর। ওর ঠোঁট ছুঁয়ে থাকল অদ্ভুত মিষ্টি, সরল একটা পরিতৃপ্তির হাসি। পাশে শুয়ে দ্বিধায় ভুগছে রানা। বুঝতে পারছে না কাজটা ঠিক হলো কি না। মিলিকে ফিরিয়ে দেওয়াই কি ওর উচিত ছিল?

মিলির ঘুম যাতে না ভাঙে তাই সাবধানে বিছানা ছেড়ে উঠল ও, গোসল সেরে তৈরি হতে শুরু করল। রাতের খাবারটা সুইটে আনিয়ে ডেকে তুলবে মিলিকে, খাওয়া সেরেই বেরিয়ে পড়তে হবে কাজে।

সাত

আধখানা ঘোলাটে চাঁদের আলোয় ডিভান হোটেলের ছাদে নানা আকৃতির ছায়া সৃষ্টি হয়েছে। অর্ধেক তৈরি একটা ঘরের ছায়াটাই

সবচেয়ে বড়। এছাড়াও রয়েছে ওয়াটার টাওয়ার, এলিভেটর মেশিনারি হাউসিং আর বাচ্চাদের খেলবার নানান সরঞ্জামের ছায়া। আরেকটা ছায়া অন্যান্যগুলোর মতোই নিথর হয়ে আছে। দীর্ঘ সুঠাম দেহটা যেন পাথরে তৈরি। আধঘণ্টা হলো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সে, একদৃষ্টিতে লক্ষ করছে ডিবার্গ অ্যান্ড কোম্পানির আলোকিত সোনালী জানালাগুলো।

এখন মাত্র তিনটে জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। ওগুলো বোধহয় ডিবার্গের প্রাইভেট সুইটের জানালা, আন্দাজ করল লক্ষকারী। এরইমধ্যে সে দেখেছে একজন সশস্ত্র গার্ড বন্ধ অফিসের সামনে দিয়ে কিছুক্ষণ পরপর ঘুরে যাচ্ছে। কাজে কোনও ত্রুটি নেই তার, তবে নির্দিষ্ট একটা দরজা সে খুলছে না। ওটার ওপাশেই সম্ভবত আছে ডিবার্গ ম্যাকেঞ্জি নামের অসুস্থ এক বুড়ো মাকড়সা, বিছানায় শুয়ে শুয়ে বুনে চলেছে তার নোংরা জাল।

আজ রাতে তার জাল বোনায় বাধা আসবে।

শেষ পর্যন্ত ছায়া থেকে চাঁদের আবছা আলোয় বেরিয়ে এলো রানা। চিতার মতো নিঃশব্দে হালকা পায়ে হাঁটছে ও, কালো ট্রাউজার্স, কালো সোয়েট শার্ট আর কালো জুতো-মোজা পরেছে।

ছাদের কিনারায় এসে দাঁড়াল ও, অ্যানেক্স বিল্ডিঙের দিকে চেয়ে আছে। আরেকবার ভ্রূ কুঁচকে আর্কিটেক্টের কথা ভাবল। মাঝখানের দূরত্বটা পার হওয়া অসম্ভব নয়। কাছ থেকে দেখে এখন মনে হচ্ছে বারো ফুটের বেশি হবে না। পেন্টহাউস তৈরির কাজে ব্যবহৃত একটা তক্তা মাঝখানে রেখে পার হওয়া যেত, কিন্তু বাধ সেধেছে উচ্চতা। অ্যানেক্সটা অন্তত দশফুট উঁচু। সমস্যা সেখানেই।

দুই বিল্ডিঙের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে নীচে তাকাল রানা। দশতলা নীচে নিরেট কংক্রিটের মেঝে। যদি পড়ে যায় তা হলে

নিশ্চিত মৃত্যু।

কাজ শুরু করল ও। রাবার মোড়া হুক সহ দড়ি ছুঁড়ল অ্যানেক্সের কোপিঙের দিকে। প্রথম চেষ্টায় অসফল হলো। পরপর আরও কয়েকবার চেষ্টা করল ও। কোপিংটা পিছলা আর ঢালু, হুক আটকাচ্ছে না, হড়কে যাচ্ছে। একটু পরেই ও বুঝে গেল এভাবে হবে না। বাধ্য হয়ে একটা তক্তা বেছে নিয়ে ফিরে এলো কিনারায়। নামিয়ে রাখল তক্তা। দুটো বাড়ির ছাদ সমান হলে নাচতে নাচতে ওটার উপর দিয়ে পার হয়ে যেতে পারত ও। গভীর শ্বাস পড়ল ওর। এই পেশায় ঝুঁকির কোনও শেষ নেই। এবার অর্ধসমাপ্ত পেন্টহাউসের ওপাশ থেকে সিমেন্টের ব্যাগ আনল ও একেকবারে দুটো করে। প্রতিটার ওজন একশো পাউন্ড। হাত টনটন করে উঠল ওর। রাতটা শীতল, কিন্তু কায়িক পরিশ্রমে ঘামতে শুরু করল ও।

তক্তার প্রান্তে সিমেন্টের ব্যাগগুলো নামাল ও, তারপর তক্তাটা ঠেলে দিল বাইরের দিকে। আরও সিমেন্টের ব্যাগ এনে রাখল। পাঁচ মিনিট পর ওর পছন্দ মতো ওজন রাখা হলো তক্তার উপর। মোট ছয়টা ব্যাগ। তৈরি হয়ে গেল ওর ডাইভিং বোর্ড। তবে নীচের বদলে উপরে ডাইভ দেবে ও। আরেকবার নীচে তাকিয়ে মনে মনে নিজেকে সাবধান করল, যদি পড়ো তো মরলে!

কাজ সেরে আবার ছায়ায় ফিরে গেল ও, অপেক্ষার ফাঁকে মনোযোগ দিল অফিসটার দিকে। ওকে কেউ দেখে ফেলে থাকলে তৎপরতা শুরু হয়ে যাবে। অস্ত্র পরীক্ষা করল রানা। বেল্টে গোঁজা আছে ওয়ালথার। বাহুর খাপে স্টিলেটো তৈরি। সঙ্গে করে সায়ানাইড গ্যাস বোমাটাও নিয়ে এসেছে। ডিবার্গের মুখ খোলাতে এসবের মধ্যে স্টিলেটো কাজে লাগানোর ইচ্ছে আছে ওর। অবশ্য সঙ্গে ট্রুথ সিরামও রেখেছে ও। কিন্তু লোকটার হার্টের যা অবস্থা তাতে ট্রুথ সিরাম দিলে মারাও যেতে পারে। সিগনেট আংটির

ড্রাগটা কাজে লাগিয়ে হয়তো লোকটাকে গুহা থেকে বের করা সম্ভব।

সবকিছু ঠিক আছে বলেই মনে হচ্ছে ওর। মন থেকে সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে তক্তার কাছে চলে এলো রানা। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানে, একবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর দ্বিধায় ভুগলে বিপদের সম্ভাবনা বাড়ে। তার চেয়ে সবরকম সতর্কতা শেষে সম্পূর্ণ মনোযোগ একত্রিত করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া ভালো।

তক্তার বাইরের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াল রানা। বুঝতে পারছে ও যদি পড়ে যায় তা হলে মেঝে থেকে কোদাল দিয়ে ওকে চেঁছে তুলবে পুলিশের লোক। পিঠের কাছটা শিরশির করে উঠল ওর।

বার কয়েক হালকা লাফ দিল ও তক্তার উপর। স্প্রিঙের মতো লাফাল তক্তাটা ওর নীচে। মনে হলো ওটা যেন জীবন্ত। উপর দিকে তাকাল রানা। দশফুট উঁচুতে পৌঁছুতে হবে ওকে। পার হতে হবে প্রায় ছয় ফুট। একবারই সুযোগ পাবে ও। সফল হলে ভালো, নইলে গুড বাই এভরিবডি!

এখন!

লাফিয়ে উঠে তক্তার উপর নামল রানা, পা দুটো শক্ত করে রেখেছে। নিজের পুরো দক্ষতা কাজে লাগিয়ে শূন্যে শরীরটাকে ভাসিয়ে দিল ও। দু'হাত মাথার উপর তুলে রেখেছে। চাঁদের ফ্যাকাসে আলোয় কালো একটা তীরের মতো ছিটকে উঠল ও।

ভুল হয়ে গেল! ওর বাড়ানো দু'হাতের আঙুল ছাদের টাইলের তৈরি কোপিং স্পর্শ করল। সাঁড়াশির মতো আঙুল দিয়ে টাইল আঁকড়ে ধরতে চাইল রানা, পারল না। পিছলে যাচ্ছে আঙুলগুলো! অন্তত একটা হাতও কোপিঙের ওপাশে নিতে পারলে উঠে যাওয়া সম্ভব ছিল। শূন্যে ঝুলছে রানা, ক্রমেই পিছলে যাচ্ছে ওর আঙুল।

কয়েক মাস বা কয়েক বছর আগে এক তুর্কি রাজমিস্ত্রী কাজে

অবহেলা করেছিল, ফাটা একটা টাইল লাগায় সে, চারপাশের ফাঁকগুলোতে সিমেন্টের আস্তরও দেয়নি। শুধু সে-কারণেই বেঁচে গেল রানা। ওর ডান হাতের আঙুলগুলো ফাটা টাইলের ফাঁকে আটকে গেল। রানার স্টিলের মতো শক্ত আঙুলগুলো ধরবার জায়গা পেয়ে গেছে। ঝুলে থাকল রানা। জীবন-মৃত্যুর মাঝে তফাৎ এনে দিচ্ছে শুধু ওর চারটা আঙুল। নীচে অপেক্ষা করছে শক্ত সিমেন্টের মেঝে।

বামহাতটা কোপিঙের উপর দিয়ে ওপাশে নিয়ে গেল রানা, বাম হাতের জোরে শরীরটাকে কোপিঙের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে ছাদে তুলে ফেলল। সামান্য সরে দুই বিল্ডিঙের মাঝখানের ফাঁকটা দিয়ে তাকাল ও, পড়ে যাওয়ার চিন্তাটা মাথা থেকে সরিয়ে পরবর্তী কাজে মন দিল। একটা চিমনির আড়ালে সরে এসে অপেক্ষা করল। অ্যালার্ম বেজে উঠবে ওকে কেউ দেখে থাকলে। পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল, অ্যালার্ম বাজল না। আবার ছাদের কিনারায় চলে এলো রানা, ডিভান হোটেলের নিচু ছাদটা দেখল। উপর থেকে লাফ দিয়ে পুরু তক্তায় পড়ে মাঝখানের দূরত্ব পেরিয়ে ওই ছাদে পৌঁছে যাওয়া কঠিন হবে না। ওর ফিরবার পথ উন্মুক্ত।

আরেকবার অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখল রানা। সন্তুষ্ট হয়ে চলে এলো এলিভেটরের মেশিনারি ঘরের সামনে। যা ভেবেছিল, দরজাটায় তালা ঝুলছে। সস্তা তালা। সেলুলয়েডের টুকরো দিয়ে ওটা খুলতে তিরিশ সেকেন্ড লাগল ওর। ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আরেকটা দরজার কাছে চলে এলো রানা। এটা খোলা। একটা ল্যান্ডিঙে আছে এখন ও। পাঁচ ধাপ সিঁড়ির পরই ওপাশে একটা ফ্রস্টেড কাঁচের দরজা দেখতে পেল। বিনকিউলার দিয়ে আগে যখন দেখেছে তখন লক্ষ করেছে এরপর আছে সংক্ষিপ্ত একটা করিডর। করিডরটা চলে গেছে ডিবার্গ লিমিটেডের

অফিসগুলোয়। ওই অফিসগুলোর পর আছে ডিবার্গের প্রাইভেট সুইট। ওখানে পৌঁছুতে হলে গার্ডের একটা ব্যবস্থা করতে হবে ওকে।

করিডর এবং অফিসের কোথাও আছে এখন সশস্ত্র লোকটা।

বিড়ালের মতো নিঃশব্দে ল্যান্ডিং পার হলো রানা, সতর্ক হয়ে আছে যেন ওর ছায়া ফ্রস্টেড গ্লাসে না পড়ে। দরজার ফাঁকটা দিয়ে মিউজিকের আওয়াজ শুনতে পেল ও। আন্দাজ করল, একাকী বিরক্ত হয়ে মিউজিক শুনছে গার্ড। নিশ্চয়ই সঙ্গে করে একটা ট্র্যানজিস্টর রেডিও নিয়ে এসেছে। ভালো, মনে মনে বলল রানা। ওই মিউজিক অনুসরণ করে লোকটার কাছে পৌঁছে যেতে পারবে ও।

কাঁচের দরজাটা সামান্য ফাঁক করল রানা। ফাঁকে চোখ রেখে দেখল করিডরের মাঝখানে একটা টেবিলের পিছনে বসে আছে গার্ড। লোকটার পিঠ ওর দিকে ফেরানো। টিনের তৈরি একটা টিফিন ক্যারিয়ার থেকে খাবার তুলে তুলে খাচ্ছে সে, সেই সঙ্গে বাজনা শুনছে।

যা করবার তাড়াতাড়ি করতে হবে। অভিজ্ঞতা থেকে রানা জানে, কেউ যদি কোনও প্রাণী বা মানুষকে আড়াল থেকে অনেকক্ষণ লক্ষ করে তা হলে সেটা সেই প্রাণী বা মানুষটা টের পেয়ে যায়। সময় নষ্ট করল না রানা, নিশ্চিত পদক্ষেপে এগোল। ও আর এক ফুট দূরে থাকতে ইন্দ্রিয় সতর্ক করল লোকটাকে, ঘাড় ফেরাল সে। গার্ডের ঘাড়ে সজোরে এক কারাতে চপ বসাল রানা। ঘাড় ভেঙে খুন করবার জন্য মারেনি, লোকটা অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ে যেতে শুরু করতেই ধরে ফেলল।

দ্রুত হাতে কাজ করছে রানা। পকেট থেকে এক রোল টেপ বের হলো ওর। গার্ডের কব্জি আর গোড়ালি বাঁধল ও টেপ দিয়ে। মুখে রুমাল গুঁজে দিয়ে তার উপর টেপ লাগিয়ে দিল। এবার গার্ডের

রিভলভারটা হোলস্টার থেকে তুলে নিল ও, গুলিগুলো বের করে পকেটে রেখে রিভলভারটা রেখে দিল আগের জায়গায়। লোকটাকে ডেস্কের পা রাখবার জায়গায় ভরে ডিবার্গের প্রাইভেট সুইটে যাওয়ার সিঁড়ির দিকে এগোল ও। দরজাটা চামড়া মোড়া। নবে মোচড় দিয়ে ঠেলা দিতেই খুলে গেল। ঢুকল রানা। খাটো একটা হলওয়ে এটা। মেঝেতে পুরু কার্পেট। বেডরুমও কার্পেটে মোড়া। দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। ভিতরে বিরাজ করছে থমথমে নীরবতা। পিছনে দরজাটা লক করে দিল রানা। এখন ওরা দু'জনই শুধু আছে এই সুইটে। ইয়া মোটকা ডিবার্গ বিছানায় শুয়ে কী যেন পড়ছে।

নিজের উপস্থিতি জানান দিল না রানা। ছায়ায় দাঁড়িয়ে ঘরটা ভালো করে দেখল ও। বাতাসে হালকা সৌরভ ভাসছে, সেই সঙ্গে ওষুধের গন্ধ। বিছানার পাশের ছোট টেবিলে পনেরো-বিশ রকমের ওষুধ দেখতে পেল ও। বেশ কয়েকটা বোতল, একটা গ্লাস, চামচ আর একবাক্স বড়ি। রানার মনে পড়ল, ডিবার্গের হার্টের অবস্থা ভালো নয়। ওটার অবস্থা আজ আরও খারাপ হতে পারে। তবে সামান্যতম করুণা বোধ করছে না রানা।

ম্যাজেন্টা রঙের ঢোলা পাজামা পরেছে ডিবার্গ। খালি গা। চারটে থুতনি গোনার পর গুনতিতে ক্ষান্ত দিল রানা। চর্বিতে ভরপুর একটা দেহ। গোটা শরীরটা ঘিরে রেখেছে চর্বির স্তর। এক মাথা রুপালী চুল ছোট করে ছাঁটা। থলথলে চেহারাতে চাতুরির ছাপ। নাকটা যেন ঠিক টিয়া পাখির বাঁকানো ঠোঁট। তার নীচেই একজোড়া লালচে ঠোঁট। বানরের লালচে নিতম্বের কথা মনে হয়ে গেল ওটা দেখে রানার। মুখটা আকৃতি হারিয়েছে দাঁতের অভাবে। বেডসাইড টেবিলে কাঁচের গ্লাসে দাঁতগুলো দেখতে পেল ও, পানিতে চুবিয়ে রাখা হয়েছে।

'গুড ইভনিং!' বেডরুমে পা রাখল রানা, চলে এলো বিছানার

পাশে। 'আমাদের প্রথম মিটিং বলে গোপনেই দেখা করলাম।'

বিস্ময়ে ডিবার্গের হাত থেকে বইটা পড়ে গেল। বালিশের তলায় ডানহাত ভরতে গেল সে। ভাসা ভাসা চোখে সতর্কতা নিয়ে রানাকে দেখছে লোকটা। 'কে…কে আপনি? কী চান?'

জবাব দিল না রানা। 'হাতটা বালিশের কাছ থেকে সরান।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল ডিবার্গের। 'গার্ড আপনাকে বাধা দেয়নি?'

'না।'

'দেখেছেন ওকে?'

'দেখেছি।'

অবাক হলো ডিবার্গ। 'কী চান? আমি অসুস্থ মানুষ।'

'আমি মাওলানা আব্দুল হামিদের লোক,' নির্বিকার চিত্তে মিথ্যে বলল রানা। 'সে জানতে চেয়েছে আপনাদের পরবর্তী মিটিং কবে এবং কোথায় হবে।'

ডিবার্গের চোখে সন্দেহের ছায়া খেলে গেল। 'মিথ্যে কথা! মিস্টার হামিদ জানেন।'

রানার হাতে স্টিলেটো বেরিয়ে এলো। ওটার তীক্ষ্ণ ডগা দিয়ে ডিবার্গের গলায় সামান্য খোঁচা দিল ও। এক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে। 'কোথায়?'

'না!' ডিবার্গের গলা কেঁপে গেল। বালিশের কাছ থেকে হাত সরিয়ে ফেলেছে সে।

রানা বলল, 'আপনি কিন্তু সময় নষ্ট করছেন। মিটিং কবে এবং কোথায় হবে?'

'এখনও ঠিক হয়নি। মিস্টার হামিদকে জানানো হবে সেটা তিনি জানেন।'

রানার মনে হলো সত্যি কথাই বলছে মোটকু। স্টিলেটো সরাল না ও। 'এবারের কোকেন আর হেরোইনের চালানটা কোথা দিয়ে

যাবে সেটা বলুন।'

'কে আপনি? কার হয়ে কাজ করছেন?'

স্টিলেটোর খোঁচায় আরেক ফোঁটা রক্ত বের হলো ডিবার্গের গলার ফুটো দিয়ে।

'দাঁড়ান! কতো টাকা চাই আপনার?'

'তোমার নোংরা পয়সা আমার চাই না, ডিবার্গ। যা জানতে চাইছি জবাব দাও তার। আমার কাছে ট্রুথ সিরাম আছে। জিনিসটা তোমার হার্টের জন্য ক্ষতির কারণও হতে পারে।' স্টিলেটো সরিয়ে নিল ও, শার্টের পকেট থেকে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ আর ছোট্ট স্বচ্ছ বোতলটা বের করে দেখাল। 'পাঁচ মিনিট সময় নেবে কাজ করতে।'

অনেক কসরৎ করে বিছানায় উঠে বসল ডিবার্গ। মুখটা টকটকে লাল দেখাচ্ছে। রেগে গিয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বিছানার চাদর খামচে ধরল। শুয়ে পড়ল কাত হয়ে। বিদঘুটে মুখটা হাঁ হলো। 'ওহ্! আ! ওহ্গ্গ্গ্! হার্ট অ্যাটাক! মেডিসিন! আমার মেডিসিন! সবুজ বোতল!'

সবুজ বোতলটা তুলে নিল রানা। ডিজিটালিস। ওটা বাড়িয়ে দিতেই কাঁপা হাতে নিতে চাইল ডিবার্গ, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাই। এবার আমি…ঠিক হয়ে যাব।'

বোতলটা তার হাতে দিল না রানা। 'আগে কোকেন আর হেরোইনের চালান কোথা দিয়ে যাবে বলো, তার আগে ওষুধ পাবে না। মিথ্যে বোলো না। বললে আমি টের পাব। এই অবস্থায় ট্রুথ সিরাম তোমাকে খুন করবে।'

বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে দিল ডিবার্গ, দেখে মনে হলো ডাঙায় তোলা তিমি মাছ। প্রতিবার শ্বাস নিতে গিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। মুখটা আরও কুঁচকে গেছে তীব্র ব্যথায়। বিস্ফারিত চোখ দুটো যেন

পিংপং বল, মাটিতে পড়ে লাফিয়ে উঠবে। 'টা-টাইম নেই! আমি মরে যাচ্ছি!'

'তা হলে তাড়াতাড়ি বলো, ওষুধটা দিয়ে দেব।'

প্রচণ্ড বুকের ব্যথায় চাদর খামচাতে শুরু করল ডিবার্গ। 'উর্ফা!' ককিয়ে উঠল সে। 'উর্ফা! এডেসা পাস! তিন দিন পর। এবার ওষুধটা...ওটা...আমি মারা যাচ্ছি!'

বোতলটা বাড়িয়ে ধরল রানা। ওটা নিতে হাত বাড়াল ডিবার্গ, তারপরেই হাতটা নেতিয়ে পড়ল। পরক্ষণে দু'হাতে গলা চেপে ধরল সে। ঝটকা খেল গোটা শরীর। ঢেউ উঠল পেটে। কাতর একটা আওয়াজ বের হলো গলা দিয়ে। মাথাটা কাত হলো। মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা স্বচ্ছ বুদ্বুদ, ঠোঁটে এসে স্থির হলো, তারপর ফাটল ওটা। রানার দিকে তাকাল লোকটা, দৃষ্টিতে কোনও অভিব্যক্তি নেই।

এক মুহূর্ত পর রানা বুঝতে পারল ডিবার্গ ম্যাকেঞ্জি মারা গেছে। সিগনেট আঙটিটা একবার দেখল রানা। ওটা কাজে লাগিয়ে ডিবার্গকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া আর হলো না। এখন কিছু করার নেই আর।

পরবর্তী পনেরো মিনিট ব্যয় করল ও সুইটে জরুরি কিছু আছে কি না খুঁজতে। নেই। থাকবে আশাও করেনি ও, রুটিন চেক করতে হয় তাই করল। এরা অত্যন্ত চতুর একটা দল। প্রমাণ হাতের কাছে রাখে না কখনও। এখানেও তাদের গোপন কর্মকাণ্ডের কোনও প্রমাণ থাকবে না এটাই স্বাভাবিক।

বাদ রইল বাথরুমটা। ওখানে কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু খোঁজা ওর কর্তব্য। উর্ফা, মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে রানার। তিনদিন পর এডেসা পাস দিয়ে যাবে মাওলানা আব্দুল হামিদের কোকেন আর হেরোইনের চালানটা। মৃত্যুপথযাত্রী ডিবার্গ

বোধহয় সত্যি কথাই বলেছে। শেষ সময়ে মিথ্যে তৈরির কথা চিন্তায় আসবার কথা নয়। মাথা খাটাবার উপায় থাকে না। ডিবার্গের কথা সত্যি হলে এখন ও জানে ওকে কোথায় যেতে হবে।

টয়লেটে ঢুকেই গন্ধটা পেল রানা। এবার চিনতে দেরি হলো না। এসটোন। নেইলপলিশ রিমুভার। লা সিনেমা ব্লিউতে লেডি স্টানার অফিস আর বাথরুমে ঠিক এই গন্ধই পেয়েছিল ও। হাতির মতো লাশটার দিকে তাকাল ও, বিছানায় পড়ে আছে ওটা। লোকটা হার্টের কন্ডিশন ভালো না হলেও হয়তো মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করত।

কিন্তু তার সম্ভাবনা কম। এসটোনের গন্ধ ওকে ভাবাচ্ছে। কিছু একটা বিশেষ মানে আছে এর। ওর মন বলছে গন্ধটা ওকে যেন কিছু স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। কিন্তু কী?

মেডিসিন ক্যাবিনেট খুলল রানা। জানে কী দেখতে পাবে। ছোট একটা বোতল। ফাস্টঅ্যাক্ট। শিকাগোতে তৈরি। লা সিনেমাতেও এরকমই একটা পেয়েছিল ও বাথরুমে।

বোতলটা পকেটে পুরল ও, বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে। এখানে আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। চারপাশে আরেকবার দেখে নিয়ে সুইট থেকে বেরোনোর দরজার দিকে পা বাড়াল রানা।

দরজাটা খুলতেই সোনালী চুলওয়ালা মেরিলিন হিউলেটকে দেখতে পেল ও। ডিবার্গের প্রাইভেট সেক্রেটারি। মেয়েটার হাতে এখন ছোট্ট একটা অটোমেটিক পিস্তল। ঠিক রানার পেটে তাক করল সে। তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ইউনিফর্ম পরা গার্ড। তার হাতে শোভা পাচ্ছে রিভলভার।

চিন্তা করো, রানা! নিজেকে তাগাদা দিল রানা। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। মেয়েটাকে নিরস্ত্র করে কিছু প্রশ্ন

করতে পারলে হতো, কিন্তু গার্ড সে সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছে। লোকটার পকেটে হয়তো বাড়তি গুলি ছিল। নিজেকে হাঁদারাম মনে হলো রানার। সার্চ করে দেখা দরকার ছিল লোকটাকে।

লাথি দিয়ে মেয়েটার হাত থেকে পিস্তলটা ছিটকে সরিয়ে দিল রানা, একই সঙ্গে সামনে বেড়ে জড়িয়ে ধরল মেয়েটাকে, নিজের সামনে ধরে থাকল তাকে। গার্ড আর ওর মাঝে মেয়েটা এখন একটা বাধা। দু'পা পিছাল গার্ড। গুলি করবার সুযোগ খুঁজছে।

হিসহিস আওয়াজ বের হচ্ছে সেক্রেটারির নাক দিয়ে, নীরবে লড়ছে মেয়েটা। রানার মুখে খামচি মারতে চেষ্টা করল। এক ঝটকায় মেয়েটাকে তুলে নিল রানা, পরক্ষণেই ছুঁড়ে মারল গার্ডের গায়ে। মেয়েটার দেহের ধাক্কা খেয়ে একটা টেবিলে হোঁচট খেল গার্ড। ওটা পার হয়ে মেঝেতে চিত হয়ে পড়ল। তার উপর পড়েছে মেয়েটা। তার পিংক আন্ডারওয়্যার আর সুগঠিত ফর্সা ঊরু দেখতে পেল রানা।

পাকা চোরের মতো ঝেড়ে দৌড় দিল রানা। গার্ড আর মেয়েটা সামলে নিয়ে উঠে বসবার আগেই করিডর পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে ছাদে বেরিয়ে এলো ও। রানা মনে মনে নিশ্চিত, গার্ড গুলি করবে না ওকে। মেয়েটাই করতে দেবে না। চিকা মোস্তাক যা-ই বলুক, মেয়েটা এই ড্রাগ কার্টেলের সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে জড়িত। সে চাইবে না পুলিশি ঝামেলা হোক।

দৌড় শুরু করল রানা, নির্দিষ্ট জায়গায় টাইল কোপিং ডিঙিয়ে ঝাঁপ দিল শূন্যে। দুই বাড়ির ফাঁকের মাঝখানে এসে নিজেকে ও ঘুরিয়ে নিল নিখুঁত ফায়ারম্যান'স ফল-এর জন্য। পিঠ দিয়ে ও তক্তায় পড়বে, দু'হাতে ধরে থাকবে হাঁটু—পেশি আর হাড়ের তৈরি একটা নিরেট বল। পড়েই ডিগবাজি খেয়ে উঠে দাঁড়াবে, পৌঁছে যাবে হোটেলের ছাদে।

যদি না কেউ তক্তাটা সরিয়ে থাকে!

সরায়নি কেউ। যেমন ছিল তেমনই আছে তক্তা। তক্তার ঠিক মাঝখানে পড়ল রানা, ডিগবাজি খেয়ে সিধে হলো, তারপর দৌড়ে পৌঁছে গেল হোটেলের ছাদে। দৌড় থামাল না, সোজা ছুটল সিঁড়ির দিকে।

গার্ড আর মেয়েটা যখন অ্যানেক্স অ্যাপার্টমেন্টের ছাদে পৌঁছুল ততোক্ষণে হোটেলের ছাদে নীরব-নিথর ছায়াগুলো আর ডিভানের ছাদ থেকে বেড়ে থাকা তক্তাটা ছাড়া দেখবার আর কিছু নেই।

আট

আত্মগোপন করে থাকা রানার দেওয়া গোপন তথ্য কানেই তুলল না পুলিশ। কর্মকর্তারা হয় প্রচুর ঘুষ খেয়েছে, নয়তো তারা ব্ল্যাকমেইলিঙের শিকার। পে-ফোন থেকে ফোন করেছিল রানা, ওকে জানিয়ে দিল, অনির্ভরযোগ্য কোনও সোর্সের কথায় সীমান্ত এলাকায় বড় ধরনের কোনও রেইড করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের কাছে এমন কোনও খবর নেই যে ড্রাগের চালান যাবে এডেসা পাস দিয়ে।

বাধ্য হয়েই একা এডেসা পাসে যাবে ঠিক করল রানা। মিলি জোর দিয়ে বলল, একা রানা ব্যর্থ হতে পারে। সেক্ষেত্রে ড্রাগের চালান নষ্ট করতে আরেকটা প্রচেষ্টা করতে পারবে ও উপযুক্ত

ইকুইপমেন্ট থাকলে। কথাটায় যুক্তি আছে বুঝে আর আপত্তি করেনি রানা, মিলিকেও সঙ্গে নিয়েছে।

শেষ রাতের খানিক আগে ইয়েসিলকয় এয়ারপোর্ট থেকে চার্টার করা কার্গো বিমানে রওনা হলো ওরা। পাইলট ওদের পরিচিত, আগেও রানা এজেন্সির কাজ করেছে, ফলে কোনও প্রশ্ন করে ওদের বিব্রত করেনি।

পাইলটের কাছ থেকে কেনা সেকেন্ডহ্যান্ড একটা ছোট জিপও তুলে নিয়েছে ওরা প্লেনে। প্যারাশুট করে নামানো হবে ওটা নির্দিষ্ট জায়গায়।

এখন চুপ করে বসে ঝিমাচ্ছে রানা। মিলি ওর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে। বুশ জ্যাকেট, ট্রেঞ্চকোট আর স্ল্যাক্স পরে থাকায় ওকে দেখতে বাচ্চা মেয়েদের মতো লাগছে। ঘুমের মধ্যেও রানার একটা হাত ধরে আছে ও।

একটানা গুঞ্জন তুলে ছুটে চলেছে ওদের বিমান।

হাতে বেশি সময় নেই ওদের। ভোরের আগেই জাম্প করতে হবে। সূর্য উঠবার আগেই লুকিয়ে পড়তে হবে নিরাপদ কোনও আশ্রয় খুঁজে নিয়ে। যদি অবশ্য সূর্য ওঠে। আবহাওয়ার রিপোর্টে বলা হয়েছে ঘন মেঘে আচ্ছন্ন থাকবে আকাশ। ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা আছে। ওয়েদার রিপোর্টটা শুনে রানা এখন নিশ্চিত, আবহাওয়াবিদরা যখন বলেছে বৃষ্টি হবে তা হলে সারাদিন কড়া রোদ না থেকেই যায় না। একটা সিগারেট ধরিয়ে চিন্তার রাজ্যে ডুবে গেল ও।

ইস্তাম্বুলের পুবে পুব-দক্ষিণে ছয়শো মাইল গেলে পৃথিবীর রুক্ষতম জায়গাগুলোর একটা পড়ে। পাহাড়, মরু, জঙ্গল আর গভীর সব খাদ পরস্পরকে জড়িয়ে পেঁচিয়ে আছে ওখানে। দুর্গম একটা এলাকা। টাইগ্রিস আর ইউফ্রেতিস নদীর খামখেয়ালীপনায় সৃষ্টি হয়েছে ত্রিকোণ অঞ্চলটা। দেখলে মনে হয় দানবের দল

জমিতে চাষ দিয়েছিল, কিন্তু ফসল বুনতে ভুলে গেছে।

এই বুনো প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী বলতে কিছু উপজাতীয় কুর্দি। প্রকৃতির মতোই রুক্ষ তারা, প্রকৃতির চেয়েও নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্কর।

ঘড়ি দেখল রানা। সময় হয়ে এলো। মিলিকে ঘুম থেকে জাগাল ও। কো-পাইলট গেল প্রস্তুতির ব্যবস্থা করতে।

ভোরের সামান্য আগে প্লেন থেকে প্যারাশুট জাম্প করল ওরা দু'জন। তখনও আকাশ থেকে সামান্য আলো ছড়াচ্ছে চাঁদটা। হালকা বাতাস আছে। সেটা কোনও সমস্যার কারণ হলো না। হাত-পা না ভেঙেই মিলিকে নিয়ে সমতল একটা জায়গায় নামতে পারল রানা। ছোটখাটো জিপটা সাপ্লাইসহ আগেই নামিয়ে দেওয়া হয়েছে চারটে প্যারাশুট বেঁধে। ওদের মাথার উপর একবার চক্কর মেরে ফিরে গেল কার্গো প্লেন। সভ্যতার সঙ্গে ওদের শেষ সম্পর্কটাও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আবহাওয়া বিভাগ সম্পর্কে রানার ধারণা পাল্টাতে হলো। মেঘ ভেদ করে সূর্যটা মাঝে মাঝে মুখ বের করছে বটে, কিন্তু বৃষ্টিতে ঝাপসা দেখাচ্ছে ওটাকে। ওরা একটা পাহাড়ী গুহার ভিতর আশ্রয় নিয়েছে। গুহা থেকে সামান্য দূরেই একটা গভীর খাদ, ওটা চলে গেছে এডেসা পাসের দিকে। ওদের উত্তর আর পুবে আকাশ ছোঁয়া পর্বত চূড়া। অস্পষ্ট দেখায় ওগুলো। বছরের কোনও সময়ই ওগুলোর মাথার বরফ গলে না।

কাছেই আরেকটা গুহার ভিতর জিপটা লুকিয়ে রেখেছে ওরা।

জায়গাটা পাহাড়ী ছাগলের উপযোগী, এখানে আসবার সময় জিপ চালাতে চালাতে ভেবেছে রানা। জিপের সামনের চাকায় পিছলে গিয়ে একটা পাথর খাদের ভিতর হাজার হাজার ফুট নীচে পড়ে যাওয়ায় আগের চেয়ে সতর্ক হয়েছে ও। জিপ এখানে তেমন

একটা কাজে আসবে বলে মনে হয় না।

খাদের পাশ দিয়ে আসবার সময় মিলি এতো ভয় পেয়েছে যে একটা কথাও বলেনি। বেশিরভাগ সময় চোখ বন্ধ করে থেকেছে। মাঝে মাঝে ভরসা পাওয়ার জন্য রানাকে স্পর্শ করেছে।

গুহাটা খুঁজে পাবার পর থেমেছে ওরা। ঠিক করেছে কাজে নামবার আগে এখানেই বিশ্রাম নেবে। কম্বল পেতে শুয়েছে ওরা। বাইরে ঝমাঝম বৃষ্টি হচ্ছে। তাকালে মনে হয় গুহার বাইরে ধূসর একটা দেয়াল সৃষ্টি হয়েছে। শীত-শীত করছে সবারই, কিন্তু আগুন জ্বালানো যাবে না গুহার ভিতর। শুকনো কাঠ থাকলেও জ্বালানো যেত না, ধোঁয়ায় শ্বাস আটকে আসত। বাতাসটা বাইরে থেকে আসছে। গুহার সামনে উপর দিকে চওড়া কার্নিশ মতো আছে। ওটার তলায় আগুন জ্বালানো যায়, কিন্তু ঝুঁকিটা রানা নিতে চায়নি।

মিলি আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। উঠল রানা। গুহামুখের কাছে রাখা রাইফেলটা আরেকবার পরখ করে দেখল। এটা কাজে লাগতে পারে মিলির। মিলিই এই অ্যাসাইনমেন্টে ওর ব্যাকআপ। রানা যদি ব্যর্থ হয় তা হলে দূর থেকে অনুসরণ করবে সে ড্রাগের চালানটাকে। কুর্দিদের সহ ড্রাগের চালানটা ধ্বংস করে দেবে টিএনটি-২৫ ব্যবহার করে।

রাইফেলের চেম্বারে একটা গুলি ঢুকিয়ে রাখল রানা। এদিকে নেকড়ে আর বুনো হয়ে যাওয়া বিরাটাকৃতির অ্যানাতোলিয়ান শিপডগের অভাব নেই। তাদের আক্রমণ হলেও রাইফেলটা কাজে দেবে। জিনিসটা একটা স্যাভেজ ৯৯। হাই ভোলোসিটি বল বুলেট ব্যবহার করা হয়। সঙ্গে ওয়াদারবাই স্কোপ আছে। হাত ভালো হলে তিনশো গজ দূর থেকেও নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব।

ওটা নিয়ে গুহার বাইরে এসে খাদের কিনারায় দাঁড়াল রানা। মিলি চলে এলো ওর পাশে।

‘চলো, একটু ঘুরে দেখা যাক,’ বলল রানা। ভেড়ার চামড়ার তৈরি জ্যাকেটের কলার টেনে দিল ও বৃষ্টি থেকে বাঁচতে। ‘আশপাশটা দেখে রাখো।’

‘চলো।’

কিছুক্ষণ চারপাশ দেখে যে-গুহায় জিপটা লুকানো আছে সেটায় চলে এলো ওরা। কী কী এনেছে আরেকবার পরীক্ষা করে দেখল দু’জন। ক্যাম্প করবার মতো সবকিছুই আছে। রানার সুটকেসে ঠাঁই পেয়েছে ছয়টা টিএনটি-২৫। তার থেকে তিনটে মিলিকে দিল ও। ‘রাখো। বাধ্য হলেই শুধু ব্যবহার করবে।’

ড্রাগের চালানটা নষ্ট করলেই চলবে না, সেই সঙ্গে সিন্ডিকেটকেও পঙ্গু করে দিতে হবে। সেজন্য দরকার তথ্য। রানা আন্দাজ করতে পারছে তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে। বুল হাডসন মাঠ পর্যায়ে কাজ দেখাশোনা করে। সব খবরই তার নখদর্পণে থাকতে হয়। নিশ্চয়ই তার কাছে সিন্ডিকেটের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের নাম থাকবে। ওই নামগুলো পেলে সিন্ডিকেটকে বিকল করে দেওয়া সম্ভব। অন্তত কয়েক বছর কোমর সোজা করে আর দাঁড়াতে পারবে না তারা। সেটা পুলিশের সাহায্য না পেলে। আর পুলিশের সাহায্য যদি পাওয়া যায় তা হলে এই ড্রাগ সিন্ডিকেটকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব।

রানা এবং মিলি, দু’জনই জানে, ওপিয়াম ব্যবসা কখনোই বন্ধ করা যাবে না। এতে এতো বেশি লাভ যে একদল লোক সবসময় আগ্রহী হবে পপি চাষে। তুরস্কের ছোট ছোট খামারগুলোর উৎপাদিত পপি সীমান্ত পেরিয়ে পৌঁছে যাবে প্রসেসিং ফ্যাক্টরিতে। ওখানে তৈরি হবে হেরোইন, এক সময় ঢুকে যাবে সারা দুনিয়ার অসহায় অ্যাডিক্টদের রক্তে, অনেক তরুণ-তরুণীর মৃত্যু ডেকে আনবে। যারা মরবে না তারাও বেঁচে থাকবে জীবন্মৃতের মতো।

এসব কথা ভাবতে গিয়ে মিলির কথা মনে হলো রানার। অজান্তেই চেহারার কঠোর রেখাগুলো কোমল হলো ওর। ভালো হবার জন্য অনেক কঠিন পথ পাড়ি দিয়েছে মিলি। ওর সাহসকে প্রশংসা না করে উপায় নেই। কিন্তু এটাও ঠিক যে ও লাখে একজন। ভাগ্য খুব ভালো না হলে হেরোইন বা কোকেনের মতো ড্রাগ ছাড়তে পারে না কেউ।

ডিবার্গের কথা ভাবল রানা। লোকটা নিশ্চয়ই মৃত্যুশয্যায় সত্যি কথাই বলেছিল। মরবার সময় মিথ্যে বানানোর চিন্তা মাথায় আসবার কথা নয়। সেক্ষেত্রে বুল হাডসন কুর্দিদের নিয়ে আসবেই। আর লোকটা যদি সত্যি এডেসা পাস দিয়ে আসে তা হলে রানার চোখ এড়িয়ে যেতে পারবে না। ও যে খাদের ধারে আছে তার দু'মাইল দূরেই এডেসা পাস।

দু'হাত ভরে রসদ নিয়ে গুহায় ফিরে এলো ওরা। আরেকবার ভালো মতো দেখল, ওদের নীচের খাদ এখনও সম্পূর্ণ নির্জন। খাদের দূরপ্রান্তে একদল বুনো কুকুর দেখতে পেল ওরা। ফিল্ডগ্লাস চোখে লাগাতেই দৃশ্যটা কাছে চলে এলো। বড় বড় লোমওয়ালা বুনো কুকুর, আইরিশ উলফ হাউন্ডের চেয়েও আকারে বড়। শিকার করা একটা ছাগলের মাংস খাচ্ছে ওগুলো নিজেদের ভিতর কাড়াকাড়ি করে।

গুহায় ঢুকে চুলো জ্বালল মিলি। রানা বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই জানো তোমাকে এখানেই আপাতত থাকতে হবে?'

জবাব দিল না মিলি। ব্যস্ত হয়ে রাঁধছে ও একটা ছোট্ট গ্যাসোলিন চুলোয়। একধারে রাখা কোলম্যান লণ্ঠনটা হিসহিস আওয়াজ করে সাদা আলো ছড়াচ্ছে। মিলির চেহারা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, চোখের নীচে হালকা কালি। সারাক্ষণ খারাপ কিছু আশঙ্কা করছে মেয়েটা, বুঝতে পারল রানা।

কড়াইয়ের উপর ঢাকনা দিয়ে এবার মিলি বলল, 'জানি এছাড়া

আর কোনও উপায় নেই। তুমি তো কারাভাঁর সঙ্গে যাবে। ছয়ঘণ্টা পর পিছন থেকে রওনা হবো আমি। পিছনেই থাকব তোমার ফ্লেয়ার জ্বলে উঠতে না দেখলে। নইলে তুমিই ফিরে এসে দেখা করবে। কিন্তু তুমি যদি ফ্লেয়ার না জ্বালো বা না ফেরো...তা হলে সামনে যাব আমি, চেষ্টা করব টিএনটি-২৫ দিয়ে চালানটা উড়িয়ে দিতে।'

'ঠিক।'

একটু পরেই টিনের প্লেটে ওকে খাবার বেড়ে দিল মিলি, নিজেও নিল। 'আমাকে যদি ইস্তাম্বুল ফিরতে হয় তা হলে আগে হোক পরে হোক, কার্টেলের লোক আমাকে খুন করবেই।'

মিলির কাঁধে হাত রাখল রানা। 'সব যদি পরিকল্পনা মতো চলে তা হলে কার্টেল বলে কিছু থাকবে না। কোনও বিপদও হবে না তোমার। নিজেদের বাঁচাতেই ব্যস্ত হয়ে থাকবে ওরা সবাই।' একটু থেমে বলল, 'জীপটা তুমি পরে খাদের ভেতর নামিয়ে রাখবে। তারপর সময় এলে শুধু দূর থেকে অনুসরণ করবে কারাভাঁটাকে। ছ'ঘণ্টা পিছনে থাকবে। এবার খেয়ে নাও। তোমার সাহায্য দরকার হবে আমার। আগে কখনও আমি কুর্দিদের ছদ্মবেশ নিইনি।'

'সেক্ষেত্রে অপেক্ষা করতে পারি আমরা,' বলল মিলি। 'কুর্দিরা এলে তখন ওদের দেখে ছদ্মবেশ নেয়া যাবে।'

কথাটা নেড়েচেড়ে দেখল রানা মনের ভিতর। ভালো কথাই বলেছে মিলি। ছদ্মবেশটা নিখুঁত করতে হলে সত্যিকারের কুর্দিদের দেখেই খুঁটিনাটি সব ঠিক করে নেওয়া উচিত।

পরদিন সূর্যোদয়ের পরপরই খাদে হাজির হলো কুর্দিরা। দিনটা পরিষ্কার ঝকঝকে। জোরাল সজীব বাতাস পাক খাচ্ছে টিলা-জঙ্গল-খাদের ভিতর। একটা নালায় শুয়ে আছে রানা, দু'পাশে দুটো মস্ত বোল্ডারের কারণে আড়াল পাচ্ছে। ঠিক মাঝখান

দিয়ে মাথা সামান্য বাড়িয়ে ফিল্ডগ্লাস দিয়ে কুর্দিদের দেখছে ও।

সংখ্যায় তারা অনেক। অন্তত তিরিশজন তো হবেই। ছোট ছোট কালো তাঁবু ফেলেছে তারা খাদের ভিতর, উপর থেকে দেখে মনে হয় ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে। ঘোড়া আর প্রচুর উট আছে তাদের কাছে, আরও আছে বিরাট একপাল ছাগল। ছাগল নেওয়া হয়েছে দলের আগে আগে পাঠাতে। সিরিয়ান সীমান্তে মাইনফিল্ড থাকলে আগেই সেটা টের পাওয়া যাবে। ছাগল যদি বিস্ফোরণে মারা যায় তা হলে কারাভাঁ অন্য পথে এগোবে। উটগুলোর পিঠে উঁচু করে একগাদা বস্তা বোঝাই।

আরেকটা নালায় শুয়ে দেখছে মিলি। একটু পর ওর পাশে এসে বসল মেয়েটা। 'ফিল্ডগ্লাসটা একটু দেবে? আমি কখনও বুনো কুর্দি দেখিনি।'

'ভয় পেয়ো না,' দূরবিনটা দিয়ে বলল রানা। 'তবে জেনে রাখা ভালো, ওরা দেখতে যেমন স্বভাবেও তা-ই।'

মিলিকে কেঁপে উঠতে দেখল রানা। 'যা শুনেছিলাম তার কিছুই দেখছি মিথ্যে নয়!' বলল মিলি। 'সভ্যতার আলো বঞ্চিত একদল হতভাগ্য লোক।'

দিনটা আস্তে আস্তে পার হচ্ছে। কুর্দি দস্যুদের ক্যাম্প দেখে সময়টা পার করছে রানা। বিশ্রাম নিতে গুহায় ফিরে গেছে মিলি।

বাতাস যখন কুর্দিদের দিক থেকে বইছে তখন ছাগলের ম্যা-ম্যা, ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি আর ভারবাহী উটদের আপত্তির চিৎকার শুনতে পাচ্ছে ও। অপেক্ষার সময়টা গল্পগুজব করে কাটাচ্ছে কুর্দি দস্যুরা, পোকারের মতো একটা তাসের খেলা খেলছে অনেকে। একটা ছাগল জবাই করতে দেখল রানা। ছাগলটাকে প্রায় কাঁচাই খেয়ে ফেলা হলো। চিবুনোর আগে মাংসগুলো আগুনের উপর ধরা হয়েছিল মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

বাস্ক বুল হাডসন ঠিক লোকই বেছেছে, বুঝতে পারছে রানা। কুর্দি দস্যুরা ধর্মপালনে চরমপন্থী হলেও তুর্কি আর সিরিয়ানদের জাতশত্রু। এদের চেয়ে ভালো চোরাচালানী আর হয় না। মরবার আগে পর্যন্ত লড়বে এরা, ধরা পড়লে শত অত্যাচারেও মুখ বন্ধ রাখবে। চিকা মোস্তাক এই কথাই বলেছিল হাইডআউটে। চিন্তাটা মাথা থেকে দ্রুত দূর করে দিল রানা। ও মোস্তাকের কথা ভাবতে চায় না। মানুষটা এক সময় একটা সম্পদ ছিল, পরে ওর ভুলেই মারা গেছে রানা এজেন্সির তরুণ ছেলেগুলো। ড্রাগ নিয়ে নিশ্চয়ই কারও সঙ্গে গল্প জুড়ত মোস্তাক। আর তার বেশি কথা বলবার স্বভাবটাই বিপদ ডেকে এনেছিল। অথর্ব-প্রায় মোস্তাককে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে ড্রাগ কার্টেল।

আরেক ঘণ্টা লোকগুলোকে দেখে ক্রল করে গুহায় ঢুকল রানা। এবার প্রস্তুতি নিতে হবে। ওর সুটকেস থেকে বের হলো পুরোনো ইস্তাম্বুল থেকে কেনা পোশাক। পাগড়ী পরতে সায় দিল না ওর মন, বদলে একটা শাল গায়ে দিল ও, শাল দিয়ে ঢেকে নিল মাথা। ওটা মুড়িয়ে নিলেই ওর চেহারা দেখতে পাবে না কেউ। আজ রাতে শীত পড়বে, তখন শালটা কাজে আসবে ওর।

অধিকাংশ কুর্দির মতোই রানাও দীর্ঘদেহী। কুর্দি দস্যুদের মতোই লাগল ওকে দেখতে। কুর্দি ভাষা জানা নেই ওর, কাজেই ধরা পড়বার জোরালো সম্ভাবনাটা থেকেই যাচ্ছে। কেউ কোনও প্রশ্ন করলে বা আলাপ জুড়লেই ফেঁসে যাবে ও।

ফেল্ট বুট আর দীর্ঘ প্যাডওয়ালা জ্যাকেট পরে নিল রানা। জ্যাকেটটা যেমন পুরোনো তেমনি নোংরা। ওটার গা থেকে দুর্গন্ধ আসছে। সত্যিকার এক কুর্দির কাছ থেকে কিনেছে ও জিনিসটা।

মিলি নাক টিপে ধরে বলল, 'সত্যি বলছি, গন্ধে মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাব। তুমি যাচ্ছ বলে এখন আর ততোটা খারাপ

লাগছে না ।'

'ছাগলের গন্ধ,' হাসল রানা । 'সেই সঙ্গে আছে উটের মুত, কাঁচা মাংস, রক্ত আর গোবরের মিশ্রণ । কুর্দিরা সবাই জ্যাকেটে এভাবে হাত মোছে ।' কাজটা করে দেখাল ও । 'সত্যিকারের কুর্দির পোশাক ।'

'এবার দাড়িটা পরাব?' নাক কুঁচকে জিজ্ঞেস করল মিলি ।

'পরাও ।' মুখ বিকৃত করল রানা । 'জানি অসম্ভব চুলকাবে । কিন্তু করার কিছু নেই । স্পিরিট গাম নাও । আর ওই ছোরাটা দাও ।'

খাপের মধ্যে বাঁকা ফলার ধারাল ছোরাটা গুঁজে নিল ও । দু'হাতের কব্জিতে পেঁচিয়ে বাঁধল নোংরা সাদা কাপড় । যুদ্ধে সব সময় নিজের ব্যান্ডেজ নিজেই বহন করে কুর্দিরা ।

দাড়ি আটকানোর পর একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল মিলি, তারপর একটা আয়না ধরল ওর চেহারার সামনে ।

'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করল রানা । 'মনে হচ্ছে ওদের সঙ্গে মিশে যেতে কোনও অসুবিধে হবে না । ভয়ঙ্কর লাগছে আমাকে দেখতে!'

সূর্যাস্তের আগেই এসে হাজির হলো বুল হাডসন । নালায় শুয়ে নজর রাখছে রানা, বুঝতে পারল কী করে লোকটা এই অঞ্চলে এতো স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারে । দুটো হাফট্রাক আর একটা ল্যান্ড রোভার নিয়ে এসেছে লোকটা । হাফট্রাকগুলোয় উঁচু করে স্তূপ দিয়ে রাখা হয়েছে অসংখ্য বস্তা । পশ্চিম থেকে এলো তারা, খাদ যেখানে এডেসা পাসের সঙ্গে মিশেছে সেখানে থামল ।

কুর্দিদের দলনেতা, দীর্ঘ চুলওয়ালা হিংস্র চেহারার এক লোক তার কালো তাঁবু থেকে বের হয়ে ল্যান্ড রোভারের পিছনের রংচঙে ট্রেইলারের দরজায় গিয়ে থামল । খুলে গেল ট্রেইলারের দরজা ।

সূর্যের শেষ লালচে আলোয় বুল হাডসনকে দেখতে পেয়ে কঠোরতার ছাপ ফুটল রানার দৃষ্টিতে।

মিলি বিড়বিড় করল, 'রানা, এ-ই বুল হাডসন। ড্রাগ পাচারের দায়িত্বে আছে।'

'জানি।'

বুল হাডসনের হোঁৎকা চেহারাটা প্রায় বুলডগের মতোই। শরীরটা মোটা ধাঁচের। কাঁধ দুটো ঢালু, পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধাদের মতো। চেহারায় অজস্র কাটাকুটির দাগ। নাকটা ঘুসি খেয়ে থেবড়ে গেছে। হাই লেস বুট, রাইডিং ব্রিচেস আর চামড়ার উইন্ডব্রেকার পরে আছে সে। কোমরের কাছে ওয়েব হোলস্টারে ঝুলছে ভারী একটা পিস্তল। রানার বিনকিউলারটা এতো শক্তিশালী যে বাঁটের লেখাও পড়তে পারল ও। কোল্ট .৪৫, ১৯১১ মডেল–ক্লাসিক একটা অস্ত্র। ওয়ালথারটা স্পর্শ করল রানা। জায়গামত গুলি লাগাতে পারলে ওর ওয়ালথারটাও অবশ্য কম ভয়ঙ্কর না।

কুর্দিদের নেতার হাতে চারকোনা একটা বড়সড় কাগজের প্যাকেট দিল বুল হাডসন। নিশ্চয়ই টাকা, ভাবল রানা। এবার একের পর এক নির্দেশ দিতে শুরু করল বুল হাডসন। কুর্দিরা হাফট্রাক আর ল্যান্ডরোভারের পিছনে লাইন বেঁধে দাঁড়াল। প্রত্যেকেই তারা গাড়িগুলোর পিছন থেকে বড় বড় বস্তা তুলে পাশেরজনের হাতে তুলে দিচ্ছে ঘর্মাক্ত কলেবরে। উটের পিঠ থেকে খালি বস্তা আর অন্যান্য রসদ নামিয়ে সেখানে তোলা হচ্ছে ড্রাগের বস্তা। উটগুলোর আপত্তি কানেই তোলা হচ্ছে না। কাজে কোনও খুঁত নেই। বোঝাই যাচ্ছে একাজে দলটা অভ্যস্ত। বিরাট একটা চালান নির্বিঘ্নে চলে যাবে তুরস্ক থেকে সিরিয়ার ভিতর। ওখানে চালানের দায়িত্ব নেবে মাওলানা আব্দুল হামিদ।

পশ্চিমে পাহাড়ের ওপাশে সূর্যটা এখন লালচে আভা বিলানো

একটা ক্ষয়িষ্ণু গোলক। শীঘ্রি আঁধার নামবে। দক্ষিণে আর দশ মাইল দূরে সিরিয়ার সীমান্ত।

গুহায় ফিরে এলো রানা, মিলির কাছ থেকে বিদায় নিল। বলবার মতো তেমন কিছু নেই। রানা যা করতে যাচ্ছে তাতে ঝুঁকির মাত্রা কতো বেশি এটা মিলি জানে। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো দাড়িওয়ালা দুর্গন্ধযুক্ত রানাকে জড়িয়ে ধরবে মিলি, কিন্তু মন শক্ত করে নিজেকে সামলে নিল সে। চোখ ছলছল করছে ওর।

'রাইফেলটা রেখে যাচ্ছি আমি,' বলল রানা। 'কোনও বিপদ হলে কাজে লাগবে তোমার। এছাড়া তোমার কাছে টিএনটি-২৫ রইল। প্রয়োজনে বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করবে।'

রাইফেলটা হাতে তুলে নিল মিলি 'সাবধান থাকব আমি।'

'গুড। আরেকবার বলছি, যদি দূর থেকে গোলাগুলির আওয়াজ পাও তা হলে কাভার নেবে। ফ্লেয়ার না দেখলে ছ'ঘণ্টার আগে এগোবে না ভুলেও। যদি দেখো আমি ফিরছি না, যা ভাল বোঝো করবে। ঠিক আছে?' মিলির হাতদুটো ধরল রানা, নিচু গলায় বলল, 'কোনও ঝুঁকি নিয়ো না, প্লিজ!'

আস্তে করে মাথা দোলাল মিলি।

গুহা থেকে বেরিয়ে এলো রানা, পাহাড়ী ছাগলের মতো নিঃশব্দে এবং গোপনে খাদের পাড় বেয়ে নামতে শুরু করল। বিরাট উঁচু সব পাথরের ছায়ায় আড়াল নিয়ে নামছে ও। ওর লক্ষ্য কয়েকটা বোল্ডার। ওগুলোর কয়েকটা কুর্দিদের ক্যাম্পের একশো গজের ভিতরও আছে। দ্রুত নামছে সন্ধ্যার আঁধার। পাহাড়ী অঞ্চলে যেন উপর থেকে কেউ কালো একটা চাদর নামিয়ে আনছে। ধৈর্য ধরে স্থির হয়ে অপেক্ষা করল রানা। কুর্দিরা রওনা হলে পিছনে পাহারা থাকবে। খাদটার গলা এডেসা গিরিপথে

ঢুকবার সময় সরু হয়েছে, সেটাই হবে ওর কুর্দিদের দলে মিশে যাওয়ার উপযুক্ত সময়।

সূর্যাস্তের শেষ আলো অবশেষে ধূসর হলো। তারও সাত ঘণ্টা পর তাঁবু উঠিয়ে খাদ ধরে তারার ম্লান আলোয় এগোতে শুরু করল কুর্দিদের দলটা। ছায়ার মতো অনুসরণ করল রানা। বামদিকে একশো গজ পিছনে আছে ও। বিরাটাকৃতি পাথরগুলোর আড়াল নিয়ে এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝেই পিচ্ছিল পাথরে পা পিছলাচ্ছে ওর, তবে পড়ল না একবারও, নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখল।

যা আশা করেছিল তার আগেই সুযোগটা এসে গেল ওর। পিছনের প্রহরীদের একজন দলছুট হয়ে রানার কয়েক ফুট দূরে ঘোড়া থেকে নামল। পোশাক নিয়ে টানাটানি লাগিয়ে দিল সে। প্রস্রাব করবে। একটা পাথরের গায়ে কাজ সারতে শুরু করল লোকটা। ঠিক ওই পাথরের আড়ালেই আছে রানা। কুর্দির ঘোড়া অপরিচিত লোকের গায়ের গন্ধ পেয়েছে। নাক দিয়ে আওয়াজ করে সরে যেতে চাইল জন্তুটা।

কুর্দি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল যাতে ভিতু ঘোড়াটার হাত থেকে সে মুক্তি পায়। 'চুপ, শয়তানের বাচ্চা! চুপ! চুপ না করলে শেয়াল দিয়ে খাওয়াব তোকে।'

পিছানো থেমে গেল জন্তুটার, তবে ওটার কান খাড়া হয়ে আছে। নাক দিয়ে আওয়াজ করে অস্বস্তি প্রকাশ করছে। আবার গাল বকল কুর্দি। 'তুই অসুস্থ উটের বাচ্চা। স্বয়ং শয়তানও তোকে নেবে না। ঈশ্বরের দাড়ির শপথ...হাইও!'

ঘাড়ে কারাতে কোপ খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল লোকটা। যাতে ওটা পালাতে না পারে সেজন্য চট করে ঘোড়াটার রাশ ধরে ফেলল রানা। এরপর কুর্দির ব্যান্ডেজ দিয়েই তাকে আচ্ছামতো বাঁধল ও। এবার অচেতন দেহটা পাথরের পিছনে নিয়ে রাখল।

কাজটা করতে গিয়ে ঝুঁকতে হলো ওকে। লোকটার কপালে একটা বাঁকা চাঁদ আঁকা দেখতে পেল। কারণটা বুঝতে পারল না রানা। নির্দিষ্ট উপদলের চিহ্ন? একটা মুহূর্ত দ্বিধায় ভুগল রানা, কারণটা জানে না। কুর্দিরা কপালে চিহ্ন এঁকেছে তা হলে। চাঁদটা আবারও দেখল রানা, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে কুর্দির ঘোড়ায় উঠে বসল, কাফেলাটাকে পিছন থেকে অনুসরণ শুরু করল ও।

পরবর্তী এক ঘণ্টা কোনও বিঘ্ন ছাড়াই কেটে গেল। একধার দিয়ে চলল রানা, ছাগলের পাল আর অভিযোগরত উটগুলোকে দূর থেকে পার হতে দিল। চাঁদ ওঠেনি আজ রাতে, মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ।

দক্ষ আরোহীর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে ঘোড়াটা, এখন নির্দেশ দিলে বিনা দ্বিধায় পালন করছে। পাঁচ মাইল পার হয়ে এসেছে ওরা, আন্দাজ করল রানা। সীমান্ত আর পাঁচ মাইল দূরে। ওর মনের ভিতর পরিকল্পনা তৈরি হতে শুরু করেছে। বাস্ক বুল হাডসনকে চাই ওর। লোকটার কাছ থেকে সিন্ডিকেট বিষয়ক তথ্য আদায় করতে হবে। তারপর ধ্বংস করতে হবে ড্রাগের চালান। সব যদি ঠিক মতো চলে তা হলে ড্রাগের চালান নষ্ট করতে টিএনটি-২৫ তিনটেই যথেষ্ট হবে। বিস্ফোরণ ঘটলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যের মতো পালাতে থাকবে কুর্দিরা, সেই সুযোগে সরে পড়বে ও। কুর্দিরা নেই নিশ্চিত হয়ে ফ্লেয়ার জ্বালবে। জিপ নিয়ে এসে ওকে তুলে নিতে পারবে তখন মিলি।

হঠাৎ ছয়জন ঘোড়সওয়ারীকে মূল দল থেকে সরে পিছনের দিকে আসতে দেখল রানা। বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর। এদিকে আসছে কেন লোকগুলো? কারণ কী? পিছনে কী আছে যে আসছে? মিলি আছে পিছনে জিপ নিয়ে, কিন্তু ও তো আছে অনেক

পিছনে, নিরাপদে।

কারাভাঁর কাছে সরে এলো রানা ওর ঘোড়া নিয়ে। খেয়াল করল এবার অন্য তিনজন কুর্দি আসছে ওর দিকে। পেশি আড়ষ্ট হয়ে গেল রানার। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ খাটিয়ে মনটা শান্ত রাখল ও। এরকমটা ঘটতেই পারত। এখন ঘটছে এটাই বাস্তব সত্য। বোবার অভিনয় করবার প্রস্তুতি নিল রানা। মনে মনে আশা করছে যাকে পিছনে ফেলে এসেছে তার কোনও ভাই বা আত্মীয় নেই এদের মধ্যে। এমন কেউ হয়তো নেই যে ধরে ফেলতে পারবে ও নকল লোক।

অশ্বারোহীরা বারো ফুট দূরে থামল। তাদের একজন হাতের ইশারায় ডাকল রানাকে। 'বুরায়া গেলিনিজ!' তুর্কি ভাষায়: এদিকে এসো।

কৌশলটা অনেক পুরোনো। ফাঁদে পড়ল না রানা। খুব কম কুর্দিই তুর্কি ভাষা বোঝে বা বলে।

বোকার মতো অশ্বারোহীদের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল রানা। মুখের কাছে হাত নিয়ে বোবাদের মতো আওয়াজ করল। ভিতরে ভিতরে নড়ে গেছে রানা। উদ্ধার পাওয়ার পথ খুঁজে চলেছে ওর মস্তিষ্ক। ওর সঙ্গে তুর্কি ভাষায় কথা বলা হলো কেন?

ঘোড়াসওয়াররা ঘিরে ফেলল রানাকে। তাদের আচরণে মনে হলো না তারা সতর্ক বা শত্রুভাবাপন্ন। তাদের একজন একটা প্যানকেক ধরিয়ে দিল ওর হাতে। কুর্দি ভাষায় কী যেন বলল।

ইস্পাতের মতো শক্ত আঙুল দিয়ে রানার ঘোড়ার রাশ খামচে ধরল আরেকজন। ঘোড়াটাকে সে কারাভাঁর দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। এখনও কারও আচরণে মনে হচ্ছে না কিছু সন্দেহ করেছে। কারাভাঁ থেমেছে, লক্ষ করল রানা। ছোট ছোট

জটলায় ভাগ হয়ে আলাপ করছে কুর্দিরা। একটু পরই গোল একটা বৃত্ত তৈরি করে দাঁড়াল। ছায়ার মধ্যে ওদিকে একই রকম আরেকটা বৃত্ত দেখতে পেল রানা। ঘোড়ার পিঠে চড়ে কি একটা প্রহরা-বৃত্ত রচনা করছে এরা?

অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করল রানা। নিজেকে শাসন করল, এখনই চিন্তার কিছু নেই। কিছু করে বসতে যেয়ো না। এখন যদি ও পালাতে চেষ্টা করে তা হলে ড্রাগের চালান নষ্ট করার পরিকল্পনা মাঠে মারা যাবে। বুল হাডসনকেও হাতের নাগালে পাওয়ার আশা ছাড়তে হবে সেক্ষেত্রে। পালাতে পারলে সেটাই এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার হবে। এদিকে এগিয়ে যাবে কারাভাঁ, সোহেলরাও যদি ব্যর্থ হয় তা হলে বাংলাদেশে ঢুকতে শুরু করবে স্বল্পমূল্য ড্রাগ। মনটাকে শক্ত করল রানা। এটা হয়তো কুর্দিদের কোনও ধরনের অনুষ্ঠান, বা আর কিছু। হয়তো ইন্সপেকশন। হয়তো নতুন নির্দেশ দেওয়া হবে। এদের সঙ্গে আপাতত তাল মিলিয়ে চলাই ভালো। টিএনটি-২৫ ব্যবহার করতে পারে ও, কিন্তু তা হলে পঞ্চাশ ফুট রেডিয়াসের ভিতর কেউ বাঁচবে না। মরতে হবে ওকেও। প্রয়োজনে তা-ই করবে ও। কিন্তু এখনই ওরকম বেপরোয়া কিছু করে বসবার সময় আসেনি।

কুর্দিরা ঘোড়া থেকে নেমে দশজন করে তিনটা বৃত্ত রচনা করেছে। রানার সঙ্গীদের একজন কুর্দি ভাষায় কী যেন বলে বৃত্ত দেখাল রানাকে। ওকেও বৃত্তে গিয়ে দাঁড়াতে বলা হচ্ছে। ঘোড়া থেকে নেমে অপেক্ষারত লোকগুলোর পাশে বৃত্তে দাঁড়াল রানা। কেউ ওর দিকে বিশেষ মনোযোগ দিল না। বৃত্তে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে গেল রানার। ব্যাপারটা কী ঘটছে এখানে?

বুল হাডসনকে বৃত্তের ভিতর দিয়ে হেঁটে আসতে দেখল রানা।

ছোট একটা টর্চ দিয়ে প্রত্যেকের চেহারা দেখছে হাডসন। পাগড়ী বা মাথার শাল সরিয়ে দিয়ে আলো ফেলছে। সন্তুষ্ট হয়ে চলে আসছে পাশেরজনের সামনে।

এবার বুঝতে পারল রানা। অতি সহজ এবং সাধারণ একটা কৌশল। অতি সহজ একটা ফাঁদ। আর ফাঁদটায় পড়ে গেছে ও!

অচেতন কুর্দির কপালের পাশে যে চাঁদটা আঁকা ছিল সেটাই ছিল এবারের চালানে তার উপদলের পরিচিতি।

রানার কপালে কোনও বাঁকা চাঁদ আঁকা নেই!

নয়

পাঁচ মিনিট সংক্ষিপ্ত লড়াইয়ের পর বন্দি করা হলো রানাকে।

সব তা হলে শেষ হয়ে গেল, ভাবছে রানা। এসপিওনাজে কখনও না কখনও মারাত্মক ভুল করে বসে এজেন্ট। এমন ভুল, যেটা নিশ্চিত মৃত্যু ডেকে আনে। এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে ও, ও-ও ঠিক তেমনই একটা ভুল করে বসেছে। বিসিআই হেডকোয়ার্টারে অনেকেই হয়তো কিছুদিন মনে রাখবে ওর নাম, তারপর সবাই আস্তে আস্তে ভুলে যাবে ওকে। যে যার কাজ নিয়ে

ব্যস্ত হয়ে পড়বে সবাই। ওর অস্তিত্ব স্মরণেও থাকবে না কারও। না, হয়তো থাকবে। সোহানা মনে রাখবে ওকে। মনে রাখবে ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবরা। কিন্তু আর কখনও ওদের সঙ্গে আড্ডা মারবে না রানা।

হাল ছেড়ে দিয়ো না, মনের ভিতর গম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও। রাগ হচ্ছে ওর নিজের উপর। এতো সহজ একটা কৌশলের কাছে বোকা বনতে হয়েছে, এটা মানতে সায় দিচ্ছে না মন। বুল হাডসন শিশুসুলভ একটা কৌশল করেছে, যাত্রা শুরুর আগে প্রতিটা উপজাতির সবকজন কুর্দির কপালে এঁকে দিয়েছে একটা করে বাঁকা চাঁদ। এক ঘণ্টা পর কারাভাঁ থামিয়ে দেখতে চেয়েছে সবার কপালে ওই চিহ্ন আছে কি না। নতুন কেউ জুটে থাকলে ধরা পড়তেই হবে তাকে। এ থেকে রানার উদ্ধার পাওয়ার কোনও সুযোগই ছিল না। সরে পড়তে চেয়েছিল রানা, ছায়ায় মিশে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু ঘোড়সওয়াররা ওকে ঘিরে ফেলল। পাঁচজন কুর্দি যখন ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন ওর আর করবার কী থাকে। এরপর ছেঁচড়ে ওকে নিয়ে যাওয়া হলো বাস্ক বুল হাডসনের সাজানো-গোছানো ট্রেইলার ট্রাকে। ওখানে সার্চ করা হলো। ওয়ালথারটা নিয়ে নিয়েছে বুল হাডসন। স্টিলেটো, বাঁকানো ফলার ছোরা, গ্যাসবোমা, ফ্লেয়ার আর বেল্টে বাঁধা চারটে ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড কেড়ে রাখা হয়েছে। অণ্ডকোষের পাশে ছোট্ট থলে থেকে ঝুলন্ত টিএনটি-২৫ তিনটে পায়নি তারা। কিন্তু এখন এই অবস্থায় টিএনটি-২৫ থাকলেও ওর কোনও কাজে আসবে না। পিটিয়ে ওকে আধমরা করেছে কুর্দিরা। এখন রানা দাঁড়িয়ে আছে বুল হাডসনের সামনে। দশ-বারোটা জায়গার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে ওর। মাথার চুলগুলো এলেমেলো। পিছনে পিঠের কাছে শক্ত করে বাঁধা হাত দুটো টনটন করছে ব্যথায়।

ছোট ফিল্ড ডেস্কের পিছনে বসে খুব মন দিয়ে রানাকে দেখল বুল হাডসন। কথা বলবার আগে একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে ওটা দিয়ে তাল ঠুকল ডেস্কে। তার পিছনে বসে আছে দু'জন লালমুখো আমেরিকান। তাদের চোখে খেলা করছে কৌতূহল। রানা তাদের জন্য কোনও সমস্যা নয়। অন্তত এখন তো নয়ই।

বুল হাডসনের শুয়োরের মতো কুতকুতে চোখের চারপাশে অজস্র কাটাকুটির দাগ। নিচু গলায় কথা বলে উঠল, ভাব দেখে মনে হলো রানার, চাকরির ইন্টারভিউ নিচ্ছে।

'নাম?'

'জোসেফ হলব্রিজ।'

মৃদু হাসল বুল হাডসন। 'মিথ্যে বলছ, মাসুদ রানা। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি তো বিসিআইয়ের লোক?'

'বিসিআই?' অবাক হয়ে তাকাল রানা। 'আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না।'

দু'জন আমেরিকানের একজন আরেকজনের কানে কানে কী যেন ফিসফিস করল, তারপর বাস্ক লোকটার দিকে তাকাল। 'বিসিআই? আমাদের আমেরিকান মাফিয়ার অনেক ক্ষতি করেছে ওদের এজেন্ট মাসুদ রানা।'

'হ্যাঁ, এ-ই সেই মাসুদ রানা,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল বুল হাডসন।

চুপ করে থাকল রানা। হয়তো একটা সুযোগ এখনও পেতে পারে ও। কিন্তু আপাতত কিছু করে বসতে যাওয়া ঠিক হবে না। এখনও সময় আসেনি।

সরু চোখ করে অগ্নিদৃষ্টিতে রানাকে দেখছে আমেরিকান মাফিয়ার দুই সদস্য। তাদের একজন বলল, 'আপনার কাজ শেষ হলে একে আমরা চাই। একে আমাদের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব?

আমাদের ডনরা খুব খুশি হবেন বস্টনে একে হাতের মুঠোয় পেলে।’

ভ্রূ কুঁচকে উঠল বুল হাডসনের। ‘সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না,’ বলল সে। ‘আমাদের সিন্ডিকেটের কয়েকজন মাথাও এর সঙ্গে কথা বলতে চায়। আপনারা পরে সুযোগ পাবেন, যদি তখনও এ বেঁচে থাকে। তার আগে মনে রাখবেন, এই চালানটা সম্পূর্ণ আমার অধীনে যাচ্ছে। আপনারা আমার অতিথি, কাজেই সেভাবে চলবেন। এবারের চালান ঠিক মতো যাওয়ার পরই আমাদের সঙ্গে চুক্তিতে আসছেন আপনারা।’

‘নিশ্চয়ই। আপনি তো জানেন আমরা আফগানিস্তান থেকে অপারেট করব।’

রানার দিকে তাকাল বুল হাডসন। ‘শুনলাম ইস্তাম্বুলে তুমি আলোড়ন সৃষ্টি করেছ, মাসুদ রানা?’

‘বলতে পারো,’ শার্টের কাঁধে ঠোঁটের রক্ত মুছল রানা। ‘ইঁদুর দেখলে আমার সহ্য হয় না। মেরে ফেলি।’

কঠোর হয়ে উঠল হাডসনের চেহারা। ‘একা এসেছ নিশ্চয়ই?’

‘অবশ্যই। আমি সব সময় একা কাজ করি।’

‘এটা সম্ভবত আরেকটা মিথ্যা, নইলে তোমার কাছে ফ্লেয়ার থাকত না। ঠিক আছে, সত্যি কী মিথ্যা সেটা আমি ঠিকই জানব। ছয়জনের সশস্ত্র একটা দলকে আমি পিছনে পাঠিয়েছি খুঁজে দেখতে।’

মিলির কথা চকিতে খেলে গেল রানার মাথায়। মিলি ওর নির্দেশ পালন করলেই হয়। তা হলে এখন ও অনেক পিছনে আছে। সেক্ষেত্রে বেশিরভাগ সম্ভাবনা ওকে খুঁজে পাবে না কুর্দিরা। আর যদি পায়ও, মিলির কাছে রাইফেল আর টিএনটি-২৫ আছে। কুর্দিদের ঠেকাতে পারবে ও প্রয়োজনে।

রানার চিন্তার জাল ছিন্ন হলো বুল হাডসনের কথায়। ইতালিয়ান আমেরিকান মাফিয়াসোদের সঙ্গে চোস্ত কর্সিকান ভাষায় কথা বলে উঠল সে। রানা যেমন কপালে চাঁদ না এঁকে ভুল করেছিল এটাও তেমনি একটা ছোট্ট ভুল। কিন্তু সময়ে ছোট ভুলই মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। হাডসনের বোকামিটা এতো সাধারণ যে প্রথমে রানা সন্দেহ করেছিল ওকে ভুল তথ্য দিচ্ছে লোকটা। নির্বিকার চেহারায় দু'পক্ষের কথোপকথন শুনতে শুরু করল ও।

রানাকে পাত্তা না দিয়ে মানচিত্রে কী যেন একটা দেখাচ্ছে হাডসন দুই সঙ্গীকে। তারপর তাকে বলতে শুনল রানা।

'এই যে এখানে কার্দু নদী। টাইগ্রিসের একটা শাখা। এই ঘাট আমরা আগে কখনও ব্যবহার করিনি। মাইন থাকতে পারে, কিন্তু সীমান্ত রক্ষী নেই। দু'দেশেরই সীমান্ত রক্ষীদের প্রচুর টাকা দিয়ে কিনে নেয়া হয়েছে। আশপাশের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে থাকবে না তারা। এখানে তুরস্ক আর সিরিয়ার সীমান্ত। যদি মাইন থাকে তা হলে এক মাইল পশ্চিমে আরেকটা ঘাট আছে, ওখান দিয়ে পার হবো আমরা।' মানচিত্রে তর্জনী দিয়ে খোঁচা মারল হাডসন।

'মাইন থাকে প্রায়ই?' উদ্বিগ্ন দেখাল এক আমেরিকানকে।

কাঁধ ঝাঁকাল বুল হাডসন। 'মাঝে মধ্যে থাকে। সবসময় নয়। কখনও কখনও মাইনফিল্ডে গিয়ে পড়ি আমরা। সেকারণেই ছাগল ব্যবহার করা হয়।' ম্যাপটা ভাঁজ করে রানার দিকে তাকাল বাস্ক। ইংরেজিতে বলল, 'ইস্তাম্বুলে তোমাকে খোঁজা হচ্ছে, রানা। কিন্তু নির্দেশটা পালন করব কি না, তোমাকে পৌঁছে দেব কি না তা এখনও ঠিক করিনি। এখানে আমিই সর্বেসর্বা। অনেক সময় কথাটা ইস্তাম্বুলের ওরা ভুলে যায়। আর আমি এমন একজন মানুষ যে খেলতে ভালোবাসি। সামান্য মজা লোটার সুযোগ পেলেও ছাড়ি না। আমার ধারণা তুমি আমাকে মজা দেবে। খুলে বলব?'

নির্বিকার চেহারা করে রাখল রানা, আরেকবার শার্টে ঠোঁটের কোণের রক্ত মুছল। কী ঘটতে চলেছে তার একটা ধারণা আছে ওর। আপাতত নিজেকে বাঁচানোর কোনও উপায় নেই। বলল, 'বলে ফেলো।'

'বলছি,' ডেস্কে রাখা পোর্টেবল কম্পিউটারটা দেখাল হাডসন। 'তার আগে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলে নিই। তুমি ভাবতেও পারবে না রানা, সিন্ডিকেট বিষয়ে যতো ইনফর্মেশন চাও সব আছে আমার কম্পিউটারে। এটা শুধু টার্কিশ সিক্রেট পুলিশের হাতে তুলে দাও, গোটা অপারেশন বাতিল করে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে হবে আমাদের নেতা-কর্মী সবাইকে। সাপ্লাই রুট বন্ধ হয়ে যাবে। সোজা কথায় কার্টেল অচল হয়ে পড়বে। অথচ, রানা, কম্পিউটারটার এতো কাছে আছো, ইনফর্মেশনগুলো এতো কাছে, কিন্তু এখন আর কিছুই করার নেই তোমার।'

পুরু ঠোঁট ফাঁক হলো, তামাক খাওয়া খয়েরী দাঁতগুলো বের করে হাসল হাডসন।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'টর্কিশ সিক্রেট পুলিশ জানলেই যদি তোমাদের অপারেশন বন্ধ করতে হয় তা হলে তারা কিছু করছে না কেন?'

'কারণ তাদের কয়েকটা মাথা আমরা ভালো পয়সা দিয়ে কিনে নিয়েছি। সব তথ্যই আছে আমার কম্পিউটারে, রানা। কিন্তু আফসোস, তোমার কোনও কাজে আসবে না তা।

'এবার আসি অন্য কথায়। আমাকে যতোটা খারাপ লোক মনে হয় আসলে আমি ততোটা খারাপ লোক নই। আমি তোমাকে একটা সুযোগ দেব। ইচ্ছে করলে কুর্দিদের হাতে তোমাকে তুলে দিতে পারতাম। ভীষণ কষ্ট পেয়ে মরতে হতো তোমাকে। তা আমি করছি না। সুযোগ দিচ্ছি। জুয়া খেলছি এটাও ধরে নিতে

পারো। একটা উটের সঙ্গে বাঁধব তোমাকে। বলতে পারো তোমাকে আমি মাইন ডিটেক্টরের কাজ দিচ্ছি।'

'আর আমি যদি সীমান্ত নিরাপদে পার হই?' জানতে চাইল রানা।

হেসে উঠল বুল হাডসন। 'তা হলে তোমাকে ধরে আমি ইস্তাম্বুলে ফেরত পাঠাব।' মোটা একটা সিগার গুঁজল সে ঠোঁটের ফাঁকে। 'ওরা তোমাকে পাওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছে। তোমার ধরা পড়ার খবরটা দিতেই খুশি হয়ে উঠল সবাই। কাল সকালে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্লেন পাঠাবে ওরা। নিজের ভালো চাও তো আশা করো আগেই মারা যাবে। এক ভদ্রলোক তাঁর সার্জিকাল ইন্সট্রুমেন্ট নিয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনছেন। মানুষের ওপর নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে খুব ভালোবাসেন তিনি।' সিগারটা ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল হাডসন। 'আর তাঁর কাজ শেষ হলে এখানকার এই দুই আমেরিকান ভদ্রলোক তোমাকে চান। চারপাশে প্রচুর চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে তোমার। আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম তা হলে প্রার্থনা করতাম যাতে আমার উট মাইনের ওপর পা ফেলে।'

ট্রেইলারের পিছনের দেয়ালে বেশ কয়েকটা সবুজ কনসোল আছে। ওগুলোর একটা গুঞ্জন তুলতে শুরু করল। ধাতব আওয়াজ ছাড়ল একটা স্পিকার।

সিগার ঝেড়ে ছাই ফেলল হাডসন। 'ইস্তাম্বুলের কল। নিশ্চয়ই কী ঘটছে জানতে চায়।' রানার দিকে তাকাল সে। 'দুঃখের কথা, কিন্তু সামান্য মিথ্যে বলতে হবে আমাকে। ইস্তাম্বুলের ওরা চাইবে না আমরা ছোটখাটো জুয়াও খেলি।'

কর্কশ গলায় নির্দেশ দিল হাডসন। দু'জন গার্ড রানাকে ছেঁচড়ে নিয়ে বাইরে একটা রুগ্ন উটের পিঠে আচ্ছামতো বাঁধল।

আগেই হাত পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে ওর। পা দুটো এক করে বাঁধা হলো কঙ্কালসার উটের পেটের তলায়। কব্জি আর গোড়ালিগুলো চামড়ার ফিতে দিয়ে বেঁধেছে তারা বিন্দুমাত্র দয়া না দেখিয়ে। চামড়া-মাংসে দাঁত বসাল ফিতে।

কুর্দিরা রওনা হলো আবার। উটটাকে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো ছাগলগুলোর মাঝে। ওখানে আপাতত পাহারায় থাকল একজন।

সাবধানে হাতের চামড়ার বাঁধন পরখ করে দেখল রানা। গায়ের সমস্ত জোর খাটিয়েও কোনও লাভ হলো না, আধ ইঞ্চিও ঢিল হলো না ফিতে। বাঁধবার আগে ফিতেগুলো পানিতে ভিজিয়েছে কুর্দিরা। এখন ফিতে শুকিয়ে আসছে, সেই সঙ্গে আরও শক্ত হচ্ছে বাঁধন। তীক্ষ্ণধার তারের মতো মাংসে কেটে বসছে ফিতে।

ওর উটটা বিরক্তি বোধ করছে। ছাগলের উপস্থিতি পছন্দ হচ্ছে না ওটার। রানাকেও তার পছন্দ নয়। বারবার ঘাড় ফেরাচ্ছে ওটা, বড় বড় হলুদ, চৌকো দাঁত বের করে রানার পায়ে কামড় দেওয়ার চেষ্টা করছে।

কার্দুর ঘাটের দিকে এগিয়ে চলেছে কাফেলা। এখনও চারপাশ অন্ধকার, কিন্তু পর্বতশ্রেণীর উপর পুবাকাশে সরু একচিলতে রুপোলি দাগ ফুটতে শুরু করেছে। রানার আধ মাইল পিছনে কারাভাঁর সঙ্গে আসছে বুল হাডসন। নিরাপদ দূরত্ব থেকে তারা দেখতে চাইছে ঘাটে মাইন আছে কি না।

কী করা যায় ভাবছে রানা ব্যতিব্যস্ত হয়ে। উট যদি মাইনের উপর পা দেয় তা হলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে ও। যদি মাইন না থাকে তা হলেও বাস্ক বুল হাডসন ওকে বন্দি অবস্থায় ইস্তাম্বুল ফেরত পাঠাবে। ওখানে অপেক্ষা করছে ডক্টর ফ্রাঞ্জ হার্টয তার ছুরি-কাঁচি নিয়ে। বসফরাসের তীরে স্যানাটারিয়ামে চিকিৎসার নামে খুন করা

হবে ওকে। জার্মান নাজি ডাক্তাররা অসহায় বন্দি রোগীদের উপর কী জুলুম করত তা ভাবতে গেলেও শরীর শিউরে ওঠে।

কিন্তু তবুও, মাইনের বিস্ফোরণে মৃত্যু না হলে হাতে সময় পাবে ও। সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে পারবে। চোখ-কান খোলা রাখলে নিজেকে মুক্তও হয়তো করা অসম্ভব হবে না।

পানির গন্ধ পেয়ে দৌড়াতে শুরু করল ওর উট। ছাগলগুলোকে তাড়া করে সরিয়ে দিয়ে ছুটছে। ওটার পিঠের উপর বলের মতো লাফাচ্ছে রানা, পড়ছে না কেবল আঁটো করে বেঁধে রাখা হয়েছে বলে। কুর্দি প্রহরীরা এগিয়ে আসছে, গাল বকে তাড়া দিচ্ছে ছাগলগুলোকে। রানা লক্ষ করল, যারা ওর পাহারায় নেই তারাও বেশ কয়েকজন আমেরিকার তৈরি সাবমেশিনগান বহন করছে। তাদের প্রতি ছয়জনের কাছে আছে ওরকম একটা করে অত্যাধুনিক অস্ত্র। বোধহয় আমেরিকান মাফিয়ার দেওয়া উপহার।

ঘাট আর বেশি দূরে নেই, এমন সময় রানার উট মাইনের উপর পা ফেলল!

মাইনটা হাই এক্সপ্লোসিভ মাইন হলে টুকরো টুকরো হয়ে যেত রানা। কিন্তু ফেটেছে এটা অ্যান্টি পার্সোনেল মাইন। ডেইযি কাটার বা বল বাউন্সারও বলা হয় জিনিসটাকে। এমন ভাবে ওগুলো তৈরি করা হয় যে, কেউ পা দিয়ে বসলে ক্যানিস্টার ভরা শ্র্যাপনেল উপর দিকে বিস্ফোরিত হয়, দুই ঊরু আর পেট ছিঁড়েখুঁড়ে দেয়।

উটটা ছুটছিল বলে মাইন যখন ফাটল তখন জানোয়ারটার পেট ঠিক ক্যানিস্টারের উপর থাকল। প্রচণ্ডগতি তীক্ষ্ণধার শ্র্যাপনেল উটের পেট চিরে দিল। ওটার যৌনাঙ্গ ছিঁড়ে পড়ল বিস্ফোরণে। রানার গোড়ালিতে বাঁধা ফিতেও ছিঁড়ে গেল সেই সঙ্গে। উড়ে গিয়ে আতঙ্কিত ছাগলের পালের মাঝখানে পড়ল

রানা। করুণ একটা শেষ চিৎকার ছেড়ে কাত হয়ে পড়ে গেল ওর উট।

ছাগলগুলোর পিঠের উপর পড়েছে বলে তেমন একটা ব্যথা পেল না রানা। পড়বার পরমুহূর্তেই আরেকটা মাইন ফাটতে শুনল ও। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল মৃত ছাগলের দেহ। আতঙ্কিত হয়ে ধাক্কাধাক্কি করছে ছাগলগুলো। সম্বিত ফিরতে রানা দেখল বড় একটা রামছাগলের পিঠের উপর আসীন হয়েছে ও, ওটার শিঙের সঙ্গে বেধে গেছে ওর কব্জিতে বাঁধা চামড়ার ফিতে। কাত হয়ে পড়ে গেল রানা, টের পেল ফিতেয় আটকে প্রায় ঝুলছে ও। ভয়ে আতঙ্কে ছুটতে চাইছে রামছাগল। ঘনঘন মাথা ঝাঁকাচ্ছে। নামাতে চাইছে মাথায় চেপে বসা আপত্তিকর ওজনটা।

শক্তিশালী একটা জানোয়ার এই বিশেষ রামছাগলটা। রানা অনেক চেষ্টা করেও যা করতে পারেনি সেটাই করল ওটার ধারাল শিং, কব্জির ফিতে ফড়াৎ করে ছিঁড়ে গেল। হাত মুক্ত হতে দেখল রানা, উন্মত্ত রামছাগলের উপর থেকে গড়িয়ে দূরে সরে যেতে চেষ্টা করল। দু'হাতে মাথা ঢেকে রাখল। ওকে মাড়িয়ে ছুটে চলে গেল দশ-পনেরোটা ছাগল।

সাবমেশিনগানের আওয়াজে ও বুঝতে পারল ছাগলের পালের উপর গুলি চালাচ্ছে কুর্দি প্রহরীরা। উঠে দাঁড়াল রানা, দাঁড়াতে পেরে ক্ষণিকের জন্য বিস্ময় বোধ করল, কোনও হাড় ভাঙেনি তা হলে!

ছাগলের পালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রায় দু'ভাঁজ হয়ে ছুটে চলল ও। একবার ঝুঁকি নিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল এক কুর্দি প্রহরী ভীত ছাগলের পালের ভিতর তার ঘোড়া নিয়ে ঢুকে পড়েছে।

আরেকজন কুর্দি প্রহরী ব্রাশ ফায়ার করল রানাকে লক্ষ্য করে। ঝাঁপ দিল রানা, চিত হয়েই পরক্ষণে বড় একটা ছাগল হাতের

নাগালে পেয়ে ওটার গলা পেঁচিয়ে ধরল দু'হাতে। দু'পা দিয়ে ওটার পেটও আঁকড়ে ধরেছে। অন্যান্য সঙ্গীকে ছুটতে দেখে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ভারী ওজন ছেঁচড়ে নিয়ে ছুটল ছাগলটা। আরেকবার ব্রাশ ফায়ার করল কুর্দি প্রহরীরা। দিক পাল্টাল ছাগলের পাল, সরাসরি ছুটল তাদের মাঝখানে হাজির হওয়া কুর্দি প্রহরীর দিকে।

স্টিরাপ আর ফেল্ট বুট দেখতে পেল রানা পাশে। কুর্দি প্রহরী পাশ কাটাচ্ছে ওকে। স্পষ্ট বুঝতে পারল ও, এটাই ওর একমাত্র সুযোগ। প্রহরীর পা ধরে গায়ের জোরে টান দিল রানা। বিস্মিত চিৎকার ছেড়ে জিন থেকে খসে পড়ল লোকটা। দেরি না করে তারই কোমরের খাপ থেকে বাঁকানো ফলার ছোরাটা এক টানে বের করে নিল রানা, ঘ্যাঁচ করে বসিয়ে দিল কুর্দির বুকের বামপাশে। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এলো লোকটার মুখ থেকে, দাড়ি ভিজে গেল। ছাগলের পালের মাঝখানে পড়ল মৃত লোকটা। মাটিতে পড়া সাবমেশিনগানটা এক ঝটকায় তুলে নিল রানা। একই সঙ্গে হাত বাড়িয়ে ঘোড়ার রাশটাও ধরে ফেলেছে ও, চট করে উঠে বসল ঘোড়ার পিঠে। এখন যদি ও মারা যায় তা হলে লড়ে মরবে।

অন্যান্য কুর্দিরা বোধহয় ভেবেছিল প্রথম সুযোগেই সিরিয়ার সীমান্তের দিকে পালাতে চেষ্টা করবে রানা। চমক কাটিয়ে উঠবার সময় পেল না তারা, তার আগেই ঘোড়ার রাশে ঝটকা দিয়ে তাদের দিকে ছুটল রানা। শক্ত করে ধরেছে ও টমিগানটা। ট্রিগারে আঙুল চেপে বসল। লাল লাল ফুলকি বের হলো অস্ত্রটার মুখ থেকে। কর্কশ শব্দ হলো ক্রমাগত বিস্ফোরণের। এদিক ওদিক ছুটছে দ্রুতগতির বুলেট।

প্রথম দফা আক্রমণেই ধড়াস করে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ল দুই কুর্দি। অন্য দু'জন ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পালাতে চেষ্টা

করল। ফিরে চলেছে তারা অপেক্ষমাণ বুল হাডসনের ট্রেইলার লক্ষ করে। খুব দ্রুত চলে গেল দু'জন রেঞ্জের বাইরে। কিন্তু একজন কুর্দি গার্ড এখনও আছে। বেশ কাছে সে। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ছেড়ে রানার দিকে ঘোড়া নিয়ে তেড়ে এলো লোকটা, টমিগান তুলতে শুরু করেছে, গুলি করবে। ছুটছে রানার ঘোড়াটাও। যেন পুরোনো আমলের দুই নাইট সম্মানের লড়াইয়ে নেমেছে, একজনের মৃত্যু না হলে শেষ হবে না দ্বন্দ্বযুদ্ধ। লোকটা টমিগান পুরোপুরি কাঁধে তুলবার আগেই দুটো ঘোড়ার মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো। ধাক্কা সামলাতে না পেরে পড়ে গেল রানার ঘোড়াটা। ছিটকে পড়ল রানাও, কিন্তু সাবমেশিনগান ছাড়েনি ও।

বিজয়ীর চিৎকার ছাড়ল কুর্দি প্রহরী। রানার দিকে টমিগানের নল তাক করেই ট্রিগার টেনে দিল। তার আগেই শরীর গড়িয়ে দিয়েছে রানা। গুলি গাঁথল ও যেখানে ছিল, সেখানে। সামলে নিয়েই পাল্টা গুলি করল রানা, কুর্দি লোকটা পেটে একঝাঁক গুলি খেয়ে প্রায় দু'টুকরো হয়ে গেল।

ধুলো, রক্ত, গানস্মোক আর পোড়া করডাইটের গন্ধের মধ্যে উঠে দাঁড়াল রানা। ভোর হতে আর দেরি নেই। বুল হাডসনের কাছে এখানে কী হয়েছে রিপোর্ট করবে পলাতক দুই কুর্দি। সে নিশ্চয়ই ড্রাগের চালানের পথ পাল্টাবে। এদিকে আরও মাইন থাকতে পারে। ঝুঁকি নেবে না বুল হাডসন।

আহত গোড়ালি পরীক্ষা করে দেখল রানা। ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে ক্ষত থেকে। কব্জি থেকে নোংরা সাদা কাপড় খুলল ও, দ্রুত হাতে দুই গোড়ালি ব্যান্ডেজ করে নিল। কাজটা সেরেই টমিগানগুলো একে একে তুলে নিল ও, মৃত কুর্দিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিল সমস্ত গুলি।

ওর ঘোড়াটা উঠে দাঁড়িয়েছে। ওটার কিছু হয়েছে বলে মনে

হলো না। ছোট ছোট ঘাসে মুখ দিয়েছে জন্তুটা। কার্দুর শাখা নদী পার হয়ে গেছে ছাগলের পাল। চারপাশে আবার নীরবতা নেমেছে।

চারটে ভারী টমিগান আর প্রচুর গুলি বহন করে খানিক কসরত শেষে ঘোড়ার পিঠে উঠতে পারল রানা, রওনা হয়ে গেল পশ্চিমে। এক মাইল পশ্চিমে আছে আরেকটা ঘাট। বুল হাডসন সম্ভবত ওই ঘাট দিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করবে। আর ঠিক ওখানেই হাডসনের জন্য অপেক্ষা করবে রানা।

দশ

রানা যখন পশ্চিমের ঘাটে পৌঁছল তখন বরফে মোড়া পাহাড়ের কাঁধের উপর দিয়ে মুখ তুলেছে সোনালী গোলকের মতো সূর্যটা। কার্দু এখানে চওড়া হয়ে বয়ে গেছে, তবে পানির গভীরতা হাঁটু সমান। ঝকঝকে পরিষ্কার পানি বড় বড় মসৃণ পাথরখণ্ড পাশ

কাটিয়ে ছুটে চলেছে। ঘাটের কাছেই ছোট একটা দ্বীপ মতো আছে। জায়গাটাকে প্রাকৃতিক একটা দুর্গ বললেই চলে। উইলো আর ট্যামারিস্ক গাছের মাঝখানে পড়ে আছে পাথরের বড় বড় খণ্ড, সহজেই আড়াল নেওয়া যাবে। ঘোড়াটাকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে পানিতে নামতে বাধ্য করল রানা, পৌঁছে গেল দ্বীপটাতে। টমিগানগুলো পাশে নামিয়ে একটা বড় পাথরের পিছনে অবস্থান নিল। উটের গোঙানি শুনতে পাচ্ছে। কাছে চলে আসছে কারাভাঁ। উত্তরে হালকা ধুলো উড়তে দেখল। আজ ভোরেই সীমান্ত পার হতে চাইছে বুল হাডসন। কাজটায় কোনও ঝুঁকি নেই, সীমান্ত রক্ষীদের ঘুষ দিয়ে আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না রানাকে, পাঁচ মিনিট পরই উটের দল দেখতে পেল ও। একটা সরু খাদের ভিতর দিয়ে ঘাটের দিকে আসছে কাফেলা, দু'পাশে উঁচু-উঁচু পাথুরে টিলা। বাঁক ঘুরল তারা, দৃষ্টিপথে চলে এলো। টমিগান হাতে নীরবে অপেক্ষায় থাকল রানা। চারটে টমিগান আছে ওর কাছে, আরও আছে আটটা বাড়তি ক্লিপ। টিএনটি-২৫ আছে তিনটে। রানা প্রস্তুত।

কারাভাঁর পিছনে আসছে বুল হাডসনের ল্যান্ডরোভার, ট্রেইলার আর হাফট্রাক দুটো। বুল হাডসনকে দেখতে পেল রানা, একটা রোন ঘোড়ার পিঠে বসে এগোচ্ছে লোকটা, ওখান থেকেই কুর্দিদের নেতাকে নির্দেশ দিচ্ছে। বুল হাডসন যদি ওর মুক্ত হওয়ার সংবাদ পেয়ে চিন্তিত হয়ে থাকে তা হলে তার কোনও আভাস দেখা গেল না লোকটার আচরণে। সম্ভবত মনে করেছে রানা মারা গেছে, অথবা ভেবেছে কোনমতে পালিয়ে বেঁচেছে ও।

রানার চোখ সরু হলো। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে বুল হাডসন বুঝতে পারবে তার ধারণা ভুল। পাথরের উপর টমিগানের নল রেখে অগ্রসরমান দলটার দিকে অস্ত্রটা তাক করল ও

সাবধানে।

ছয়জন কুর্দি পৌঁছে গেল ঘাটে, ঘোড়া থামাল ওগুলোকে পানি খেতে দেওয়ার জন্য। একজন কুর্দি ঘোড়া থেকে নেমে সবার পানির বোতলগুলো ভরতে শুরু করল। তার উপরই প্রথমে লক্ষ্যস্থির করল রানা, ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়ল ওর। ঘোড়াগুলোকে এড়াতে চাইছে ও, একই সঙ্গে চেষ্টা করছে উপস্থিত কুর্দিদেরও গুলি করতে।

প্রথম দফা গুলিবর্ষণে চারজন কুর্দিকে ফেলে দিতে পারল ও। একটা ঘোড়া আহত হয়ে তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার ছেড়ে পড়ে গেল পানিতে। বার কয়েক পা ছুঁড়ে স্থির হয়ে গেল। বাকি দুই কুর্দি ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে। আরেক পশলা গুলি বের হলো রানার টমিগান থেকে। জিন থেকে খসে পড়ল কুর্দি দু'জন। ধুলোর মধ্যে পড়েই থাকল তাদের নিথর দেহ। মানুষ মারছে বলে মনে হচ্ছে না রানার। মনের ভিতর স্পষ্ট জানে, এরা পশুরও অধম, অসহায় দুর্বলচিত্ত অসংখ্য তরুণ-তরুণীর অকাল মৃত্যুর দায়ে দায়ী। গুলি বন্ধ করে তৈরি টমিগান হাতে অপেক্ষা করছে ও ক্ষতিকর আরও কিছু পশু হত্যার জন্য।

কারাভাঁতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। উটগুলো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছে। বুল হাডসনকে দেখতে পেল রানা, লোকটা ঘোড়া থামিয়েছে। দ্বীপটার দিকে একবার তাকিয়ে ঘোড়ার পেটে খোঁচা মেরে ফিরে চলল সে কারাভাঁর পিছনে দাঁড়ানো হাফট্রাক আর ল্যান্ড রোভারের কাছে। ঘোড়া থেকে নেমে ট্রেইলারের ভিতর ঢুকে গেল লোকটা। এক মুহূর্ত পরই বের হয়ে এলো আবার। এখন তার হাতে বিনকিউলার। তার সঙ্গে দুই আমেরিকানও আছে। তিনজনই যেখান দিয়ে এসেছে সেই খাদের বাঁকের দিকে ছুটছে, দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে যাবে।

ঘোড়া দাবড়ে তাদের পিছনে পৌঁছে গেল কুর্দিদের দীর্ঘদেহী নেতা, তার হাতে লম্বা নলের একটা রাইফেল। বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হলো সবাই। মনের ভিতর একটা অস্বস্তি জেগে উঠল রানার। কুর্দি নেতার হাতের রাইফেলটাই এখানে ওর দেখা প্রথম স্কোপ লাগানো রাইফেল। দূর থেকে দেখেও মনে হয়েছে ওটা অত্যন্ত আধুনিক জিনিস। ঠিক ওরকম একটা রাইফেলই ও মিলির জিম্মায় রেখে এসেছে।

মিলির কী হলো? যে ছয়জন কুর্দি পিছনদিকে ফিরে গিয়েছিল তারা কি ওর হদিস পেয়ে গেছে?

সরু খাদের এক ধারে উঁচু পাথুরে দেয়ালের উপর কাঁচের গায়ে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হতে দেখল রানা। আপাতত মিলির চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল ও। আন্দাজ করল, বুল হাডসন আছে ওখানে, টেলিস্কোপ দিয়ে ওকে দেখতে চেষ্টা করছে। একটু সময় হয়তো লাগবে, কিন্তু লোকটা ঠিকই বুঝে যাবে ও ঠিক কোথায় আছে। বুঝে যাবে প্রতিপক্ষ মাত্র একজন। মাসুদ রানা একাকী আক্রমণ করেছে।

বিইইইইং করে আওয়াজ হলো পাথরে বুলেট পিছলে যাওয়ার। চমকে গেল রানা। ওর মাথা যেখানে আছে তার ছয় ইঞ্চি দূরে পাথরে ঠোকর মেরে বেরিয়ে গেছে বুলেট। একটু পিছিয়ে এলো ও অজান্তেই। বুঝতে পারছে বাড়তি সুবিধা হারিয়েছে। সামান্য সময়েই বুল হাডসন মোটামুটি জেনে গেছে ওর অবস্থান।

আরেকটা গুলি ঢুকল পাথরের ফাঁক দিয়ে। বারবার তিনদিকের পাথরে বাড়ি খেতে শুরু করল ওটা। ডানদিকে শরীর গড়িয়ে দিয়ে একটা ট্যামারিস্ক গাছের কাণ্ডের আড়ালে সরে এলো রানা। পাথুরে আড়ালের ফাঁক দিয়ে একের পর এক

বুলেট আসছে, এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে শক্তি ফুরিয়ে মাটিতে খসে পড়বার আগে। পাথর খণ্ডের মতোই স্থির হয়ে পড়ে থাকল রানা। ওকে এখনও খুঁজে পায়নি বাস্ক বুল হাডসন। লোকটা জানে ও কোথায় থাকতে পারে, তবে নিশ্চিত নয় সে। তার কপাল অতিমাত্রায় সহায়তা না করলে আপাতত রানার আহত হওয়ার তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই।

থেমে গেল রাইফেলের গুলি বর্ষণ। ক্ষণিকের জন্য মনে হলো দু'পক্ষের কারও কিছু করবার নেই। কিন্তু সেটা মাত্র একটা মুহূর্তের জন্য। কয়েকটা ঝোপ সামান্য সরিয়ে নদীর ওপারে তাকাল রানা। ওর ডান আর বামদিক দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত ছুটে আসছে কুর্দি দস্যুরা, গলা ছেড়ে চিৎকার করছে। এতো জোরে স্পার দাবাচ্ছে যে ঘোড়াগুলোর পেট থেকে রক্ত ঝরে লাল হয়ে গেছে তাদের স্পার। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই রানার টমিগানের রেঞ্জের বাইরে চলে গেল তারা। এবার ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে কার্দু নদীতে নামল। ওসব জায়গায় কার্দু নদী বেশ গভীর। কুর্দিদের ঘোড়াগুলো সাঁতার কাটছে। গলাটা শুকনো ঠেকল রানার। দু'দিক থেকে আক্রমণ করতে চাইছে কুর্দি দস্যুরা!

বুল হাডসন ওকে খুন করে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা হলে! পালাচ্ছে না লোকটা, অন্য কোথাও দিয়ে চালানটা পার করবার কথাও ভাবছে না। লোকটা নিশ্চয়ই জানে মাসুদ রানা দ্বীপটাতে লুকিয়ে আছে। ওর কাছে আছে চারটে টমিগান আর যথেষ্টরও বেশি গুলি। তারপরও পিছিয়ে যাচ্ছে না সে। পিছাবার কথাও নয়, প্রতিপক্ষ যতো শক্ত লোকই হোক, সংখ্যায় সে মাত্র একজন। তিক্ত হাসল রানা, পাশে পড়ে থাকা একটা শুকনো ডাল তুলে নিল। দৈর্ঘ্যে ওটা অন্তত দশফুট হবে। ঝোপের

ভিতর দিয়ে ডালটাকে সাবধানে ঠেলে দিল রানা, দীর্ঘ ঘাসের একটা গুচ্ছের কাছে লাঠিটা পৌঁছুতেই ওটা নাড়তে শুরু করল। এদিক ওদিক মাথা হেলাচ্ছে হলদেটে ঘাসগুলো।

একটা বুলেট ঘাসের গুচ্ছ ভেদ করে বড় একটা পাথরে লেগে সশব্দে চ্যাপ্টা হয়ে গেল। বুল হাডসনের পরিকল্পনা বুঝতে দেরি হলো না রানার। লোকটা ওকে এখানেই আটকে রাখতে চাইছে। সেই ফাঁকে দু'পাশ আর পিছন থেকে ওকে ঘেরাও করে শিকার করতে আসবে কুর্দিরা। চমৎকার একটা যুদ্ধ-কৌশল। এতোটাই নিখুঁত যে, বেঁচে যাওয়া প্রায় অসম্ভব!

রানা যখন প্রথম কুর্দি দস্যুকে হত্যা করে তখন তার বাঁকানো ফলার ছোরাটা নিয়ে নিয়েছে, এখন ওটা দিয়ে নরম মাটি আর বালি খুঁড়তে শুরু করল ও। বুঝতে পারছে অগভীর একটা ফক্সহোল খুঁড়বার সময় হয়তো পাওয়া যাবে কপাল ভালো থাকলে। দ্রুত হাত চলছে ওর, সমস্ত মনোযোগ একত্রিত করে খুঁড়ে চলেছে। অত্যন্ত সতর্ক, কনুইয়ে ভর দিয়ে সামান্য উঁচুও হচ্ছে না ও।

ফক্সহোল খুঁড়বার ফাঁকে খাদের ভিতর থেকে আবারও উটের দলের গোঙানি আর ডাক শুনতে পেল ও। আগের চেয়ে দ্রুত চলতে শুরু করল ওর হাত। বুল হাডসনও যদি ওর মতো করে ভেবে থাকে তা হলে ওই উটগুলো উন্মত্তের মতো ছুটে আসবে নদীর অগভীর অংশটার দিকে। ও যাতে কিছু করতে না পারে সেজন্য রাইফেলের গুলিতে ওকে আটকে রাখা হবে এখানেই। দ্বীপ পার হওয়ার সময় পিষে দিয়ে যাবে ওকে ছুটন্ত ভারী জন্তুগুলো।

দূর থেকে মশার গুঞ্জন যেন শুনতে পেল রানা। মাটি খোঁড়ায় বিরতি না দিয়েই আকাশে চোখ বুলাল ও, বেশ খানিক পর দেখতে

পেল খুদে বিমানটা। চিনতে পারল। এলসি ফোর প্লেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আর্টিলারি খুঁজে বের করবার কাজে ব্যবহৃত হতো। ওটার গায়ে সিরিয়ান মার্কিং এতোটা দূর থেকেও স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে।

মোটামুটি কাজ চলবার মতো মাটি আর বালি খুঁড়তে পেরেছে ও। অগভীর ফক্সহোলটায় ঢুকে পড়ল রানা, প্লেনটাকে চক্কর কাটতে দেখছে। হঠাৎ কর্কশ আওয়াজ করে গর্জে উঠল কয়েকটা সাবমেশিনগান। তারই ফাঁকে শোনা গেল বুনো চিৎকার। কুর্দি দস্যুরা প্লেনটা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে।

একটা-দুটো গুলি বোধহয় লেগেছে বিমানে, কারণ দ্রুত বাঁক নিয়ে উপর দিকে উঠতে আরম্ভ করল ওটা, ক্রমেই সরে যাচ্ছে। পশ্চিম দিকে রওনা হলো। কোনও সন্দেহ নেই সবচেয়ে কাছের সীমান্ত রক্ষীদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করেছে পাইলট। তাতে রানা কোনও বাড়তি সুবিধে পাবে তা নয়। সবচেয়ে কাছের প্যাট্রল হয়তো কয়েক ঘণ্টার পথ দূরে আছে।

সিরিয়ান সীমান্তের দিক থেকে এলো কুর্দি দস্যুদের প্রথম আক্রমণ। সোজা দ্বীপটা লক্ষ্য করে ছুটে আসছে তারা। গুলি ছুঁড়তে শুরু করল রানা। থামল হাতে টমিগানের নলের ছ্যাঁকা খেয়ে। পুরো ক্লিপটা শেষ হয়ে গেছে। তবে কাজ হয়েছে, ঝটিকা আক্রমণে ক্ষান্ত দিয়ে গুলির আওতার বাইরে চলে গেল কুর্দিরা। এক ঝটকায় আরেকটা টমিগান তুলে নিল রানা, ডানদিক থেকে আসা কুর্দি দস্যুদের দিকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। ঘাটের দিক থেকেও আসছে কুর্দিরা, তীক্ষ্ণ রণহুঙ্কার ছেড়ে ঘোড়াগুলোকে দ্রুত ছুটতে উৎসাহিত করছে। তাদের মধ্যে গুলি করছে কয়েকজন। একটা গুলিও রানার ধারেকাছে এলো না। কারণটা দেখতে গিয়ে গলা শুকিয়ে গেল রানার।

বেশিরভাগ কুর্দি দস্যু দীর্ঘ বর্শা বহন করছে। মৃত্যুর আগে কতোটা কষ্ট হবে ভাবনাটা মাথা থেকে জোর করে দূর করতে হলো ওকে। আরেক পশলা গুলি করল ও লোকগুলোকে লক্ষ্য করে। কয়েকজন ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল পানিতে। দুটো ঘোড়াও পড়ল। কিন্তু তবু আসছে কুর্দিরা।

বামদিকের আক্রমণ ঠেকাতে ওদিকে মনোযোগ দিতে হলো এবার রানাকে। ব্রাশ ফায়ারের ফাঁকে মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল, কুর্দিদের হাতের তাক মোটেই ভালো নয় বলে। ঠিক তখনই ওর কাঁধে আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। ছ্যাঁৎ করে জ্বলে উঠল জায়গাটা। আরেকটা বুলেট হাঁটুর কাছে প্যান্ট ছিঁড়ে দিয়ে গেল। ওর চারপাশের পাথরে অজস্র গুলি এসে লাগছে, তীক্ষ্ণ শব্দে দিক বদলে ছুটে যাচ্ছে নানাদিকে। এক নাগাড়ে গুলি করছে রানা। একটার পর একটা টমিগান তুলে নিচ্ছে হাতে যন্ত্রের মতো। মাঝে মধ্যে ওর গুলিতে আহত কিংবা নিহত হচ্ছে দু'একজন কুর্দি, কিন্তু তাদের এগিয়ে আসায় কোনও বিরতি নেই। তারপর বিনা নোটিশেই ফিরতি পথ ধরল দস্যুদল। বুঝতে পেরেছে সরাসরি আক্রমণের ঝুঁকি নেওয়ার আর কোনও প্রয়োজন নেই।

ওদিকে কুর্দিদের তাড়া খেয়ে ঘাটের দিকে দ্রুত ছুটে আসছে উন্মত্ত উটের দল। বুল হাডসনকে এক পলকের জন্য দেখতে পেল রানা। নিজে এখন একটা হাফ ট্রাক চালাচ্ছে লোকটা। তার পিছনে আসছে হাফ ট্রাক আর ট্রেইলার সহ ল্যান্ড রোভার। দুই আমেরিকানের একজন ল্যান্ড রোভারটা চালাচ্ছে। তার পাশে বসে আছে অন্যজন। রানার মনে হলো সিনেমা দেখছে, আর দৃশ্যগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে খুব বেশি দ্রুত। উটের দল ছুটে চলেছে তাড়া খেয়ে। মুখের কাছে কিছু দেখলেই বড় বড় দাঁত দিয়ে কামড়ে

দিচ্ছে ওগুলো।

ওগুলো দ্বীপের উপর দিয়ে ছুটে যাবে। পিষে মারবে রানাকে। পড়ে থাকবে থেঁতলানো একটা মাংসপিণ্ড। চিনবার উপায় থাকবে না কারও।

চট করে রানার হাত চলে গেল ব্যাগি কুর্দিশ পায়জামার ভিতর, তিনটে টিএনটি-২৫ই বের করে আনল ও। এক মাথার নব ঘুরিয়েই গায়ের জোরে একে একে ছুঁড়ে দিল রানা ওগুলো অগ্রসরমান দলটার দিকে। কাজটা করেই অগভীর গর্তে মুখ লুকাল ও। বুঝতে পারছে যতোটা দূরে ছুঁড়তে চেয়েছিল কাগজী লেবু আকৃতির বোমাগুলো ততোটা দূরে ছুঁড়তে পারেনি বেকায়দা অবস্থানের কারণে। মনে মনে ও বলল, রানা, এভাবেই হয়তো শেষ হওয়া ছিল তোমার ভাগ্যে। একটা বিস্ফোরণ তুমি পার করে এসেছ। এবারেরগুলো সম্ভবত তোমাকে খুন করবে।

ওর দেহের নীচে থরথর করে কেঁপে উঠল জমিন। কানে তালা ধরানো গুরুগম্ভীর একটা প্রলম্বিত ভরাট প্রচণ্ড গর্জন শুনতে পেল ও। মুখ তুলল রানা, দেখতে পেল ওর ফুট পঞ্চাশেক দূরে একটা পাঁচ টন ওজনের পাথরের বোল্ডার আকাশে লাফ দিয়ে উঠেছে। রানার মনে হলো বেশ খানিকক্ষণ শূন্যে যেন স্থির হয়ে ভেসে থাকল ওটা, তারপর থ্যাপ শব্দ করে পড়ল ওর মাথা থেকে চার ফুট দূরে। আরেকবার কেঁপে উঠল ওর চারপাশ, তারপর এলো শকওয়েভ। গরম বাতাসের হলকা নিয়ে এলো যেন স্বয়ং মৃত্যুদূত। কানে কিছু শুনতে পেল না রানা, হঠাৎ করেই যেন বধির হয়ে গেছে। খপ করে ওকে আঁকড়ে ধরল যেন দানবীয় একটা হাত, তারপর মুঠোয় পুরে ওকে ছুঁড়ে দিল আগুনে পোড়া গরম কয়েকটা পাথরের উপর। ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল রানা। তারপর টের পেল, আরেকবার ওর নাগাল পেয়ে গেছে অদৃশ্য

শক্তিটা। ক্ষণিকের জন্য জ্ঞান হারাল ও। নইলে দেখতে পেত, বাতাসে ওড়া তুলোর মতো তিরিশ ফুট উড়ে গিয়ে কার্দু নদীতে গিয়ে পড়েছে ও।

নাকে-মুখে পানি ঢুকে যেতে সচেতন হলো রানা, কাশতে কাশতে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। ওর মনে হলো হাঁটুগুলো রাবারের তৈরি। হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল ও অগভীর পানিতে। কানে কিছু শুনতে পাচ্ছে না। প্রথমে বুঝতে পারল না ও কোথায়। উহ্, গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে! ঢক ঢক করে কয়েক ঢোক পানি খেল ও। চোখে-মুখে পানির ছিটা দিল। আরেকবার চেষ্টা করল উঠে দাঁড়াতে। ব্যর্থ হলো আবার। হামাগুড়ি দিয়ে তীরের দিকে এগোল ও। সামনের দৃশ্যটা দেখে মনে হলো খোদ নরকে উপস্থিত হয়েছে।

নড়ছে না কিছুই। একটা প্রাণীও বেঁচে নেই। দূরে উটের ডাক শুনতে পেল। যে'কটা বেঁচে গেছে সেগুলো বোধহয় ফিরে গেছে খাদের ভিতর নিরাপদ আশ্রয়ে। এখানে ওখানে পড়ে আছে উট, ঘোড়া আর মানুষের দেহের পোড়া টুকরো টাকরা। দুটো মাথা আর সাতটা হাত দেখল রানা। তারপর চোখে পড়ল কয়েকটা ঊরু।

দুটো হাফট্রাকই উল্টে পড়েছে। জ্বলছে এখনও ওগুলো। জ্বলন্ত ল্যান্ড রোভারটা মাটিতে নাক গুঁজে দাঁড়িয়ে পড়েছে। শুধু ট্রেইলারটা, আশ্চর্যজনক হলেও একদম অক্ষত! শামশের আলীর কথাগুলো মনে পড়ল রানার। খুব ছোট হলেও আণবিক বোমার সঙ্গে বিস্ফোরণের মিল পাওয়া গেছে টিএনটি-২৫এর। চারপাশের সবকিছু হয়তো ধ্বংস করে দিল, অথচ একটা জায়গার হয়তো একেবারে কিছুই হলো না।

এবার উঠে দাঁড়াতে পারল রানা, টলতে টলতে ট্রেইলারের দিকে এগোল। মনে পড়েছে ওর অস্ত্রগুলো ওখানে আছে। চোখে

ঝাপসা দেখছে ও এখনও। ট্রেইলারের কাছে নড়াচড়াটা প্রথমে ওর মনে হলো চোখের ভুল, তারপর বুঝতে পারল ও ছাড়াও আরও কেউ বেঁচে আছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার ওদিকে তাকাল রানা। এবার স্পষ্ট দেখতে পেল। বুল হাডসন! লোকটা হোঁচট খেয়ে ট্রেইলার থেকে নামল। দুটো বড় বড় ব্যাগ তার হাতে, অপ্রকৃতিস্থের মতো এদিক ওদিক তাকাল, কিন্তু কিছু দেখল বলে মনে হয় না। পা টেনে টেনে হাঁটতে শুরু করল। দু'পাশে উঁচু টিলাওয়ালা খাদটার দিকে চলেছে সে। বার কয়েক হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। উঠল আবার। টলতে টলতে এগোল। বারবার পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু উঠছেও আবার। দু'হাতের ব্যাগ দুটো এতো কিছুর মধ্যেও হাতছাড়া করছে না।

টাকা, আবছা ভাবে চিন্তাটা এলো রানার মাথায়। নিশ্চয়ই টাকা আছে ওই ব্যাগগুলোয়। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেও টাকার চিন্তা দূর হয়নি পিশাচটার মাথা থেকে।

চিৎকার করে লোকটাকে ডাকবার চেষ্টা করল রানা। গলা আবার শুকিয়ে যাওয়াতে ঠিক মতো আওয়াজ বের হলো না। মাতালের মতো এলোমেলো পদক্ষেপে পিছু নিল রানা। তবে বুল হাডসনের তুলনায় দ্রুত এগোচ্ছে ও। দূরত্বটা ক্রমেই কমছে। বুল হাডসন পৌঁছে গেছে টিলা-ঘেরা খাদের মুখে। ওখানেই ধুপ করে পড়ে গেল লোকটা। তখনও ব্যাগ দুটো হাত থেকে ছাড়েনি।

বুল হাডসনের কাছে আরও পাঁচ মিনিট পর পৌঁছুল রানা, পা দিয়ে লোকটাকে চিত করল ও। দেহটা গড়ানোর সময় গুঙিয়ে উঠল হাডসন। তার চেহারার অর্ধেকটা পুড়ে কালো হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই ফেটে গেছে বড় বড় ফোস্কাগুলো। ঠোঁট দুটো নেই

এখন আর, লাল মাড়ি আর হলদে দাঁত দেখা যাচ্ছে। গলে গেছে একটা চোখ। ওটার শিরাটা গালের উপর ঝুলছে লোকটার। পুরো দেহ ছেঁচে গেছে বিশ্রী ভাবে, সারাদেহে রক্ত চটচট করছে, কিন্তু এখনও বেঁচে আছে হাডসন। অবশিষ্ট আধবোজা চোখটা মেলে রানাকে দেখল সে, বাতাসের জন্য হাঁস-ফাঁস করছে। ব্যাগটা দেখাতে চেষ্টা করল। অস্পষ্ট উচ্চারণে বলল, 'আমি...আমার নির্দেশে নয়...ওরা...' দীর্ঘ বিরতি দিল। অপেক্ষা করছে রানা। কী বলতে চায় লোকটা?

একটা ব্যাগ রানার দিকে ঠেলে দিতে চেষ্টা করল হাডসন। 'নাও তুমি! তুমি নাও। কবর দিয়ো...দায়ী না...আমি না...কুর্দিরা...উন্মাদ...ওরা...আমি বলিনি...আমি...'

ক্ষণিকের জন্য রানার মনে হলো দেহে শক্তি ফিরে আসছে ওর। ব্যাগটা তুলে নিতে গেল ও, বুল হাডসনের হাত থেকে ওটা খসে আসবার সময় ব্যাগের মুখটা খুলে গেল। কী যেন একটা গড়িয়ে পড়ল, স্থির হলো রানার পায়ের কাছে।

জিনিসটা মিলির কাটা মুণ্ডু!

বুকের ভিতর অব্যক্ত একটা কষ্ট অনুভব করল রানা। দাঁতে দাঁত পিষল বীভৎস দৃশ্যটা দেখে। শিউরে উঠল একবার। ওর চোখ যেন আটকে গেছে কাটা মাথাটার উপর।

চুড়ো করে বাঁধা রক্তমাখা চুলের উপর এখনও ছোট লাল বেরেট পরে আছে মিলি। ওটাতে আটকানো রানার উপহার দেওয়া রুপোর পিনটা চকচক করছে। চোখ দুটো বন্ধ মিলির। কিন্তু মুখটা হাঁ হয়ে আছে। মরবার আগে খুব কষ্ট পেয়েছিল মিলি?

বিড়বিড় করে কী যেন বলতে চেষ্টা করছে বাস্ক শয়তানটা। বালিতে খামচি মারছে তার ক্ষতবিক্ষত একটা হাত। ফিসফিস করল, 'ওরা...আমি...না! দোষ...আমার...নেই! ওরা...বলিনি

ওদের…ওরা…কুর্দিরা…উন্মাদ! ওরা…মেয়েটা…তিনজন কুর্দিকে খুন করেছিল সে। বাকিরা…মেয়েটাকে রেপ করেছে ওরা…আমার কাছে…নিয়ে এসেছে…মাথাটা। আমার কাছে…কম্পিউটার…মাফ করে দাও… সব পাবে…আমি…সব খবর…মাফ…মাফ করে…'

মিলির কাটা মাথার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল রানা, আস্তে করে হাঁটু গেড়ে বসল বুল হাডসনের পাশে। হাডসন তখনও কথা বলতে চেষ্টা করছে। দু'হাতে লোকটার গলা টিপে ধরল রানা। কী করছে যেন ও সচেতন নয় ঠিক। আস্তে আস্তে আঙুলের চাপ বাড়াচ্ছে রানা। আঙুলে খিঁচ ধরল। আরও জোর খাটাতে চেষ্টা করল ও। বুল হাডসন এখনও শ্বাস নিচ্ছে। দুর্বলতার কারণে নিজেকে গাল দিল রানা।

অস্বচ্ছ চিন্তা ওকে বলে দিচ্ছে হয় মিলি ওর নির্দেশ মানেনি, টিএনটি-২৫ ব্যবহার করেনি, অথবা হয়তো অসতর্ক অবস্থায় ফাঁদে পড়ে যায় ও। মিলিকে রেপ করেছে কুর্দিরা, তারপর মাথাটা কেটে নিয়ে এসেছে বুল হাডসনকে দেখানোর জন্য।

আরও জোরে হাডসনের গলা টিপতে চেষ্টা করল ও। সাড়া দিচ্ছে না অবশপ্রায় আঙুলগুলো।

বিস্ফোরণের কারণে টিলার মাথার পাথরগুলো আলগা হয়ে গেছে। চোখের কোণে উপরে পাথরের নড়াচড়া দেখতে পেল রানা। বুঝে ফেলল কী ঘটতে যাচ্ছে। অন্য ব্যাগটা বুল হাডসনের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল ও, নিয়েই ফাঁকা জায়গা লক্ষ্য করে দৌড়াতে চেষ্টা করল। টলতে টলতে এগোতে পারল শুধু। আবার চোখে ঝাপসা দেখছে ও, মাথাটা যেন চরকির মতো ঘুরছে। বুকের ভিতর হাহাকার করছে ওর। বারবার মনে হচ্ছে ওর দোষে মরল মিলি। এগিয়ে চলেছে রানা মাতালের মতো। বিশ ফুট…বাইশ…পঁচিশ ফুট…

ওর পিছনে ধসে পড়ল একদিকের টিলা। থ্যাচ করে একটা আওয়াজ শুনে চলার উপরই ফিরে তাকাল ও, এখনও গা শিউরানো কর্কশ আওয়াজ তুলে পড়ছে পাথর।

নিরাপদ জায়গায় চলে এসেছে বুঝে বসে পড়ল বিহ্বল রানা। পাথর পড়া শেষ হলে উঠে দাঁড়াল আবার। টলায়মান পায়ে ফিরে এলো খাদের কাছে। পাথরের স্তূপের নীচে কবর হয়ে গেছে মিলির মাথাটার। ওই একই স্তূপের নীচ থেকে বুল হাডসনের দু'পা বেরিয়ে থাকতে দেখল ও। পা ধরে টেনে শরীরটা বের করে আনল রানা। দেহটার সঙ্গে মাথা নেই এখন আর। বিরাট একটা বোল্ডার সম্ভবত পিষে ফেলেছে মাথাটাকে! পিছিয়ে এলো বিবশ রানা, ব্যাগটা তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীর অনিশ্চিত পায়ে ফিরে চলল অক্ষত ট্রেইলারের দিকে।

নিজের সমস্ত অস্ত্র পেল ও দেয়ালের গায়ে কাত হয়ে পড়ে থাকা ডেস্কের কোনায়। ওগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে ব্যাগটা খুলল। ছোট একটা অ্যাপেল ল্যাপটপ কম্পিউটার আছে ভিতরে। এই জিনিস আগেও ব্যবহার করেছে রানা। নির্দিষ্ট স্লটে চাপ দিয়ে ছোট্ট হার্ডডিস্কটা বের করে প্যান্টের পকেটে পুরল ও। মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাগুলো পরিষ্কার করতে চেষ্টা করল। সীমান্ত রক্ষীরা যদি আসে তা হলে তাদের কী বলবে ও? বিশ্বাসযোগ্য কিছু বলতে না পারলে ওকে ধরে জেলে পুরে দেবে ওরা। সিরিয়া কিংবা তুরস্ক, যে-দেশের জেলেই ঢোকাক, পচে মরতে হবে ওখানে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মাথাটা কাজ করছে না ওর। মাঝে মাঝেই ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি।

ট্রেইলার থেকে নামল ও। দূরে আবার প্লেনের গুঞ্জন শুনতে পেল। কারা আসছে? বর্ডার প্যাট্রল? কী করবে ও? অসহায় বোধ করল রানা।

নদীর মাঝখানের দ্বীপটাতে বেঁচে আছে একজন কুর্দি দস্যু। পাথরের উপর দিয়ে মাথা তুলল আহত লোকটা। ট্রেইলারের কাছে একজন লোক দেখে নিচু স্বরে গাল বকল সে। ওই বাস্ক হারামজাদা তা হলে বেঁচে আছে? চারদিক যেন দোজখের আগুনে পুড়েছে। অথচ ওই লোকটা...

পাশে পড়ে থাকা লম্বা নলের প্রাচীন রাইফেলটা অনেক কষ্টে তুলে নিল সে, লোকটার পিঠে সাবধানে লক্ষ্যস্থির করল। অন্যান্য অনেকের মতো অটোমেটিক অস্ত্রে তার বিশ্বাস নেই। স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করল সে, তার লক্ষ্য যাতে ঠিক থাকে। এবার ট্রিগার টেনে দিল। বেকায়দায় ধরা রাইফেলের ঝাঁকিতে মনে হলো, কাঁধের হাড় ছুটে গেল রানার। ব্যথার বোধ যেন তার নেই। তৃপ্তির সঙ্গে দেখল ঝাঁকি খেল একাকী মূর্তিটা, পরমুহূর্তে ঢলে পড়ল কুর্দি দস্যু মৃত্যুর কোলে।

এগারো

সোনালী রথে চেপে সাদা মেঘের ভিতর দিয়ে যেন নামছে রানা। রেশমী কোমল একটা অনুভূতি। তারপর মনে হলো অন্ধকার আঠাল একটা কুয়ার ভিতর থেকে উঠে আসছে ও। শ্বাস আটকে

আসতে চায়। ফুসফুসে যেন কেউ পাথর ভরে দিয়েছে। পেট চেপে ধরেছে কেউ সাঁড়াশি দিয়ে। হঠাৎ বুঝতে পারল, যে-ঢাল বেয়ে উঠছে ও সেটা খুব পিছলা। দু'পা এগোলে এক পা নেমে যাচ্ছে পিছলে। এক সময় ঢালের উপর উঠল রানা, চোখের সামনে ঝাপসা ভাবে দেখতে পেল সবুজ কাঁচের একটা দেয়াল। চারপাশে সবকিছু যেন ঘুরছে, কিন্তু কাঁচের দেয়ালটা আছে।

ওই দেয়ালটার ওপাশে মানুষের আকৃতি নড়ছে চড়ছে। তাদের ডাকতে চেষ্টা করল রানা, গলা দিয়ে দুর্বল গোঙানি বেরিয়ে এলো। অসহায় বোধ করল রানা। কেউ জানে না ও এখানে আছে, বেঁচে আছে এখনও। দৃষ্টি আস্তে আস্তে পরিষ্কার হচ্ছে ওর। এখন একজনকে পরিচিত মনে হচ্ছে। ডিনার জ্যাকেট পরা এক যুবক। চকচকে কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা। কুচকুচে কালো চোখ। উপরের ঠোঁটের কাছে মোম মাখানো পেন্সিল গোঁফ। এগিয়ে আসছে লোকটা। ভাবতে চেষ্টা করল রানা, একে আগে কোথায় যেন দেখেছে ও?

ওই লোকটা, ডিনার জ্যাকেট পরা লোকটা সম্ভবত শেভ করবে। শেভ? না—তা তো নয়! তা হলে পকেট থেকে ক্ষুর বের করেছে কেন সে? ওকে শেভ করিয়ে দেবে? না হলে এদিকে আসছে কেন? সতর্ক হওয়ার কোনও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে না রানা। সবুজ কাঁচের দেয়ালের এপাশে নিরাপদ জায়গায় আছে ও। ক্ষুরওয়ালা লোকটা এপর্যন্ত কিছুতেই পৌঁছাতে পারবে না।

আরেকজন লোক দেখতে পেল রানা। লম্বা, চিকন একটা লোক, দেখলে মাকড়সার কথা মনে পড়ে যায়। চেহারাটা শকুনের মতো। তার পরনে সাদা একটা স্মক। কৌতূহলী হয়ে চেয়ে থাকল রানা। লোক দু'জন এখন কথা বলছে। কী ব্যাপারে যেন তর্ক করছে তারা। কেন তা জানে না রানা, কিন্তু ওর মন বলছে ওর

ব্যাপারেই কথা বলছে লোক দু'জন।

মাকড়সা আকৃতির শকুনমুখোই তর্কে জিতল। কনুই ধরে ক্ষুরওয়ালা যুবককে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে। একটা দরজার কাছে চলে গেল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল যুবক। কারণ না জানলেও মনের ভিতর অদ্ভুত একটা স্বস্তি অনুভব করল রানা। শকুনমুখো বোধহয় ওর বন্ধু।

সবুজ কাঁচের ওপাশে এসে আবার দাঁড়াল সাদা স্মক পরা প্রৌঢ়। লোকটার হাতে কী যেন আছে। ছোট একটা কাপ। বিষ না কি ওটাতে?

লোকটা কী যেন ঢালল কাপে। এদিকে আসতে শুরু করেছে সে। ভয় পেল না রানা। হাসি পেল ওর। সবুজ কাঁচের দেয়াল ওকে রক্ষা করবে।

সরে গেল কাঁচের দেয়াল। হঠাৎ করে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করল রানা। ওকে ধরে আধবসা করাল সাদা স্মক, কাপের তরলটা ঠোঁটে ধরেছে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিলতে বাধ্য হলো রানা। লোকটা ওর উপর ঝুঁকে বলল, 'বেশ বেশ, শেষ পর্যন্ত জ্ঞান ফিরল তা হলে। গুড আফটারনুন।'

ইংরেজিতে কথা বলছে লোকটা, সুরে জার্মান টান স্পষ্ট। রানার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল, অস্বাভাবিক সরু ঠোঁট দুটো ফাঁক হলো, নিঃশব্দে হাসছে সে।

বসতে চেষ্টা করল রানা। কিন্তু আস্তে করে ঠেলে ওকে হাসপাতলের সাদা চাদর বিছানো খাটে শুইয়ে দিল লোকটা। রানার কাঁধে বন্ধুর মতো চাপড় দিল। রানা বুঝতে পারছে কোথায় যেন গলদ আছে। লোকটা ওর বন্ধু না। সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করল রানা। বুঝতে পারছে এটা হাসপাতালের কোনও ঘর। আর এই লোকটা ডাক্তার। ওই প্লেনটা, যেটার শব্দ

শুনেছিল ও জ্ঞান হারাবার আগে, ওটা তো সিরিয়া কিংবা তুরস্কের প্লেন? হয় ওটা ওকে এখানে নিয়ে এসেছে, না হলে কোনও দেশের সীমান্ত রক্ষীরা। দুর্গম ওই এলাকা থেকে নিয়ে এসে ওকে এখানে এই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু ওই ক্ষুরওয়ালা যুবক...ঠিক মিলছে না। না কি স্বপ্নে দেখেছে ও লোকটাকে?

ডাক্তারী সাদা স্মক পরা লোকটা ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটে কোণে তার লেগে আছে অদ্ভুত একটুকরো বাঁকা হাসি। নিজের চোখা থুতনিতে তর্জনী বোলাল সে। রানা ভাবল, সত্যি লোকটা দেখতে শকুনের মতো। অশুভ, বুদ্ধিমান কোনও শকুন। বুকে কাঁপুনি শুরু হলো রানার। এখন বুঝতে পেরেছে কোথায় আছে ও। ওই প্লেনটা...ওটা সিরিয়া বা তুরস্কের কর্তৃপক্ষের প্লেন ছিল না। ওটা ছিল কার্টেলের! ধরে আনা হয়েছে ওকে!

ডাক্তার সম্ভবত রানার চিন্তাস্রোত বুঝতে পেরেছে, হাসল লোকটা, বেরিয়ে পড়ল নিখুঁত, ঝকঝকে সাদা নকল দাঁতগুলো। 'কোথায় আছেন বুঝতে পেরেছেন তা হলে, মিস্টার রানা? জানতাম বুঝতে পারবেন। দ্রুতই বুঝেছেন। অন্য কেউ শরীরের এই অবস্থায় আরও অনেকক্ষণ বিবশ হয়ে থাকত। আপনি আমার ব্যক্তিগত দুর্গে অতিথি হয়েছেন। ক্লিনিকটা পাশেই। আপনি আছেন আমার বিশেষ রোগীদের জন্য সংরক্ষিত রুমগুলোর একটায়।'

চোখ বুজল রানা। ভাবতে হবে ওকে। একটা ঝিমানি অনুভব করছে ও। সচেতন ভাবে বুঝতে পারছে শিথিল হয়ে আসছে ওর দেহ। ওকে যেটা গেলানো হলো সেটার কারণেই কি এরকম আচ্ছন্ন লাগছে? মনের চোখে তীক্ষ্ণধার সার্জিকাল ইন্সট্রুমেন্ট দেখতে পেল ও। রাগ হলো ওর। এতো কিছুর পর, এতো কষ্টের

পর এখন ফ্রাঞ্জ হার্টযের অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হবে? বাঁচতে পারবে বলে মনে হলো না ওর। তবে হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না। রানা বলল, 'আমার নাম রানা নয়। ওই নামের কাউকে আমি চিনি না। আপনি কে? আমি কোথায় আছি?'

ওর উপর ঝুঁকল লোকটা। 'তা হলে আপনি কে?'

'আমি থমসন। এতো ঘুম পাচ্ছে কেন আমার?'

'আচ্ছা!' হাসল ফ্রাঞ্জ হার্টয। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে সাধল। নিল না রানা। থুতনিতে আবার আঙুল বোলাল ডাক্তার। 'আরও ঘুম পাবে। আরও এক ঘণ্টা বাঁচবেন আপনি, মিস্টার থমসন ওরফে রানা। মরফিনের ম্যাসিভ ডোজ দিয়েছি আপনাকে আমি। শেষ সময়টা বিশ্রাম নিন, মিস্টার রানা।'

'আমি মিস্টার রানা নই। কিন্তু আপনি কে সেটা বুঝেছি। আপনি ডক্টর ফ্রাঞ্জ হার্টয। আমি বসফরাসে আপনার স্যানাটোরিয়ামে আছি, তা-ই না? টর্চার কখন শুরু করবেন, ডাক্তার?'

'ধরেছেন ঠিক।' হাসিটা চওড়া হলো ফ্রাঞ্জ হার্টযের। 'আগে আরও গভীরে যান আপনি। এমন একটা সময় আসবে যখন আর নড়তে পারবেন না। তখনও জ্ঞান থাকবে আপনার। আর ঠিক তখনই হাতের কারুকাজ দেখাব আমি আপনার দেহের ওপর। সেজন্য যদিও জরুরি মিটিং ছেড়ে আসতে হবে আমাকে, তবু সময়টা উপভোগ না করে পারব না আমি। সত্যি বলছি, মিস্টার রানা, আপনার মতো এতো সুপার্ব ফিজিকাল কন্ডিশনে কাউকে আগে দেখিনি আমি। আপনি কীভাবে মরেন সেটা দেখা আমি কিছুতেই মিস করতে পারি না। আমাদের বিরাট ক্ষতি করে দিয়েছেন আপনি, সেটার খানিকটা অন্তত পূরণ হবে আপনাকে ধুঁকে ধুঁকে মরতে দেখলে।' রানার চুলে আদর করে

হাত চালাল ফ্রাঞ্জ হার্টয। ‘মিস্টার রানা, রনি রুথলেসকে আমি আপনার গলা কাটতে দিইনি। একটা ধন্যবাদ দেবেন না আমাকে? আপনার প্রাপ্য সম্মানটাই দিচ্ছি, রঙিন নেশা করে মরবেন আপনি।’

সত্যিই, বড্ড ঘুম পাচ্ছে। সচেতন হয়ে উঠতে চাইল রানা। আরামদায়ক অনুভূতি দরকার নেই ওর। জেগে থাকতে হবে ওকে। মিথ্যে বলবার কোনও কারণ নেই ফ্রাঞ্জ হার্টযের, লোকটা সত্যি ওকে ম্যাসিভ ডোজের মরফিন দিয়েছে। কথা বলে নিজেকে জাগিয়ে রাখতে হবে! ‘আচ্ছা,’ বলল রানা, ‘তা হলে আমি স্বপ্ন দেখিনি? ডিনার জ্যাকেট পরা লোকটা সত্যিই এঘরে ছিল?’

‘ছিল,’ থুতনিতে টোকা দিল ফ্রাঞ্জ হার্টয।

ঘুমে জড়িয়ে আসতে চাইছে দু’চোখ। ‘আমি এখানে এলাম কী করে?’

জবাব দেওয়ার আগে একটা সিগারেট ধরাল মাকড়সা, তারপর বলল, ‘ওখানে যায় আমাদের প্লেন। ধ্বংসযজ্ঞ দেখে। একজনও বাঁচেনি ওখানে আপনি ছাড়া। নতুন ধরনের কোনও বোমা ব্যবহার করেন আপনি, মিস্টার রানা, ঠিক কি না?’

‘আমি মিস্টার রানা নই। আমি থমসন।’

‘ওখানে আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়। আপনার মাথার একপাশ ছিলে দিয়ে গেছে একটা বুলেট, এছাড়া তেমন কিছু হয়নি। ওটার কারণেই আপনি জ্ঞান হারান।’

মাথায় হাত দিয়ে ব্যান্ডেজের স্পর্শ পেল রানা। এবার টের পেল, ওর দুই গোড়ালিতেও ব্যান্ডেজ করা হয়েছে। মারবার আগে ওকে যতোটা সম্ভব সুস্থ করে তুলছে এরা! ওর শরীরে আরও ছয়-সাত জায়গায় গজ কিংবা প্লাস্টার লাগানো হয়েছে।

খলখল করে হাসল ফ্রাঞ্জ হার্টয। ‘যাচ্ছেতাই অবস্থা ছিল

আপনার, মিস্টার রানা। আমাদের প্লেনে বুদ্ধিমান এক লোক ছিল, সে আপনাকে নিয়ে আসে। এশিয়াটিক সাইডে নামে আমাদের প্লেন। ওখান থেকে ক্লিনিকের অ্যাম্বুলেন্সে করে আপনাকে এখানে আনা হয়। হেভি সিডেশন দেওয়া হয় আপনাকে। গত ছত্রিশ ঘণ্টা বেঘোরে ঘুমিয়েছেন আপনি।'

ছত্রিশ ঘণ্টা! ঘরের একমাত্র জানালাটার দিকে তাকাল রানা। বসফরাসে সন্ধ্যার ছায়া ঘনাতে শুরু করেছে। ঘুম পাচ্ছে। খুব ঘুম পাচ্ছে। আরাম! আহ্! কী শান্তি! মরফিন, রানার ভিতরে যেন বিস্ফোরিত হলো ড্রাগের নামটা। না, ওকে জেগে থাকতে হবে। আচ্ছা, ওই জানালার নীচে কী আছে?

একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল ও। অন্ধকার ঘনাচ্ছে ওর চোখের সামনে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। চিন্তাগুলো যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। মিলির মিষ্টি চেহারা দেখতে পেল ও চোখের সামনে। হাসছে মিলি। ওর বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠোঁটে লেগে আছে এক টুকরো সরল হাসি। প্রচণ্ড রাগ হলো ওর। কার উপর ও জানে না।

'আমি যাচ্ছি, মিস্টার রানা,' বলল ফ্রাঞ্জ হার্টয। 'জরুরি মিটিং আছে আমাদের। আবার আসব আমি, চিন্তা করবেন না। ঠিক সময়ে দেখবেন আমি হাজির। আপাতত বিদায়।'

দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল মাকড়সার মতো লোকটা। শান্তি! প্রশান্ত একটা অনুভূতি হচ্ছে ওর। মৃত্যু যেন কোমল একটা বিছানা, ওকে ঘুমিয়ে পড়তে আহ্বান করছে। আহ্, কী আরাম! মনের ভিতর কে যেন বলছে: মরে যাও, রানা। কেন নয়? এতো আনন্দ আর কোথায় পাবে তুমি? মৃত্যু ভয়ঙ্কর নয়, মৃত্যু আরামের। বড় শান্তির। তোমার কাজ শেষ হয়েছে। আর কোনও কাজ নেই, রানা। ঘুমিয়ে পড়ো। আরাম! নিজেকে ছেড়ে দাও।

ভেসে যাও রঙিন স্রোতে।

'না, রানা, বাঁচতে হবে তোমাকে!' বুকের ভিতর থেকে গম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর আদেশ দিল ওকে। এ আদেশ লঙ্ঘন করে না ও কখনও। এই মানুষটার চেয়ে আপন আর কেউ নেই ওর। পিতার মর্যাদা দিয়েছে ও অপার স্নেহময় ওই বৃদ্ধকে। পেয়েছে পিতার অকৃত্রিম আদর। কী যেন নাম?

নামটা কিছুতেই মনে করতে পারল না রানা। শুধু দেখতে পাচ্ছে উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ দুই চোখের উপর ঘন, কাঁচাপাকা ভুরু। চোখ দুটো চেয়ে রয়েছে ওর দিকে নরম দৃষ্টিতে। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'তুমি ছাড়া আমারও যে কেউ নেই, রানা!'

নিজের উপর জোর খাটিয়ে সচেতন হতে চাইল রানা। ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। ঘামছে সেটা টের পাচ্ছে ও। ভালো। ওর অনুভূতি এখনও কাজ করছে। কিছুতেই মরব না আমি! মনে মনে চিৎকার করল রানা। আমাকে বাঁচতে হবে। সমস্ত মানসিক জোর একত্রিত করে সচেতন হতে চেষ্টা করল ও। ওর সুঠাম শরীর এতোদিন মালিকের সমস্ত নির্দেশ মেনে এসেছে, কিন্তু এখন আর মানতে চাইছে না, গড়িমসি করছে। বালিশ থেকে মাথা তুলল রানা। সচেতন হতে চেষ্টা করল ও, বাঁচার তীব্র ইচ্ছে ওকে খানিকটা শক্তি যেন ফিরিয়ে দিচ্ছে।

বিছানা থেকে যে করে হোক নামতে হবে ওকে। দাঁড়াতে হবে। বাথরুমে যেতে হবে। বমি করতে হবে। পাকস্থলি থেকে মরফিন বের করে দিতে হবে। জেগে থাকো, রানা! ঘুমিয়ে পোড়ো না!

মনটা বলছে, লুবনা, মিলি, সুলতা, রেবেকা—ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে ফেলে চলে গেছে। ও যায়নি। এখন গেলে ক্ষতি কী? কী হবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে? এদের হাত থেকে মুক্তি

মিলবে না। ডাক্তার ফ্রাঞ্জ হার্টয কি ওকে এখনও দেখছে কোথাও থেকে? বমি করতে পারলে আবার ওকে মরফিন দেবে? তা হলে এতো চেষ্টা করে কী হবে? মৃত্যু হবেই, ঠেকানো যাবে না, তা হলে এখনই মরতে দোষ কী?

আমি বাঁচতে চাই! শরীরটা গড়িয়ে দিল রানা। মেঝেটা যেন অতিদ্রুত উঠে এলো উপরে। মনে হচ্ছে যেন তুলোর মধ্যে পড়েছে ও। নরম! আস্তে আস্তে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে শরীরটা তুলল রানা, পাশে একটা চেয়ারের অস্পষ্ট অবয়ব দেখে এক হাতে ওটা ধরে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল।

ওই জানালা! থাই অ্যালুমিনিয়াম! ওপারে আছে বসফরাস। কিন্তু জানালার নীচে কী আছে? কী আছে তাতে কার কী! ওর কিছু না। কার্নিস? ব্যালকনি? পাথর? সিমেন্টের মেঝে? কী যায় আসে তাতে? যদি ওই জানালা পর্যন্ত ও যেতে পারে...ঝাঁপ দেবে ও কেউ ওকে ধরে ফেলবার আগে। হয়তো বেঁচে যাবে। কিন্তু প্রথমে যেতে হবে বাথরুমে। বমি করতে হবে।

কী ছোট বাথরুমটা! টিমটিমে ডীম লাইট জ্বলছে। কিন্তু এতো দূরে কেন ওটা? উঠতে গিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা। শরীর ছেঁচড়ে এগোল। দু'হাতে ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করল আবার। পারছে না। বড় বেশি কঠিন। না, এই তো হামাগুড়ি দিতে পারছে! যাহ্, হাঁটু পিছলে গেল। গলার ভিতর আঙুল পুরে দিল রানা। কই, বমি তো হচ্ছে না! আবার আঙুল পুরে দিয়ে চেষ্টা করল। বিচ্ছিরি স্বাদ টের পেল রানা গলার ভিতর। এতে কাজ হবে না। বমি হচ্ছে না! চারপাশ থেকে অন্ধকার যেন ঘিরে ধরছে ওকে। বনবন করে ঘুরছে মাথা। কালো একটা গভীর গর্তে যেন পাক খেয়ে খেয়ে নেমে যাচ্ছে ও। চারদিক থেকে কালো দেয়াল চেপে আসছে ওর দিকে। পিষে মারবে।

আবার এগোল রানা। মনে হলো যেন অনন্ত কাল, কিন্তু বাথরুমের দরজা পেরিয়ে ঢুকল ও ভিতরে। বেসিনটা হাতের নাগালে পেয়ে ওটা ধরে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। তিনবারের চেষ্টায় বেশ খানিকটা উঠতে পারল ও। হাঁটুগুলো যেন রাবারের তৈরি, এক্ষুণি বেঁকে যাবে। মেডিসিন ক্যাবিনেট হাতড়াল ও। এমন কিছু কি আছে যেটা ওকে বমি করতে সাহায্য করবে?

বাথসল্ট! এক বোতল বাথসল্ট আছে! আর আছে জং ধরা একটা ব্লেড।

রানা! তাড়াতাড়ি! ছোট্ট বাথরুমটার দেয়ালগুলো ওর চারপাশে দুলে দুলে পাক খাচ্ছে। আলো কমে আসছে ক্রমেই। সময় বড় কম!

চিৎকার করতে চাইল রানা, গলা দিয়ে আওয়াজ বের হলো না। কাঁপা হাতে বেসিনের রাবারের তৈরি স্টপ-ককটা আটকাল ও, বাথসল্ট ঢেলে কল খুলে দিল। মিশ্রণটা আঁজলায় তুলে গিলতে শুরু করল এবার। ঘন সুগন্ধী তরল নেমে যাচ্ছে ওর গলা দিয়ে। আবার আঁজলা ভরে গিলতে শুরু করল রানা। স্বাদটা জঘন্য। বেসিনে মুখ নামিয়ে চুমুক দিল ও, তৃষ্ণার্ত যেভাবে পানির উপর হামলে পড়ে সেভাবে গিলছে ও। বিচ্ছিরি স্বাদ! কিন্তু কাজ হচ্ছে! অসুস্থ বোধ করছে ও। অনেক দূর থেকে প্রিয় বৃদ্ধের গরুগম্ভীর গলা আবার শুনতে পেল: বাঁচতে হবে তোমাকে, রানা।

হড়হড় করে বমি করতে শুরু করল রানা। বমি থামতেই কল থেকে আবার আঁজলা ভরে পানি মুখে দিল, বাথসল্টের বোতলটা উপুড় করে ধরল মুখের উপর। বমি করল আবার। কষ্ট হচ্ছে খুব। মোচড় মারছে পেটের ভিতরটা। বুকে তীব্র ব্যথা। বমি থামতে আবার মুখে পানি নিল ও, বাথসল্ট ঢেলে

গিলে ফেলল তরলটা। আবার বমি। খুব দুর্বল লাগছে। পা দুটো আর শরীরের ভর রাখতে পারল না, বেসিনের ধাক্কা খেয়ে আরেকটু হলেই কমোডের উপর মাথা দিয়ে পড়ছিল ও, একটুর জন্য পাশে পড়ল। ব্যথা নেই কোনও। চুপ করে শুয়ে থাকল রানা। সংখ্যা গুনছে এক দুই করে। ধীরে ধীরে পঁচাশি পর্যন্ত গুনল, তারপর দাঁড়াবার চেষ্টা করল।

দাঁড়াতে পারল ও, মাতালের মতো এদিক-ওদিক টলছে। ওহ্! পেটের পেশিতে খিঁচ ধরেছে। অসহ্য ব্যথা! প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কুঁজো হয়ে গেল রানা। আরও বেশি করে খিঁচ ধরছে!

সোজা হতে চেষ্টা করল ও, চিৎকার করতে চাইল, পশুর মতো দুর্বোধ্য গোঙানি বের হলো শুধু।

জানালা! ওই জানালার কাছে যেতে হবে ওকে। যা করবার দ্রুত করতে হবে। কেউ এসে পড়বার আগেই। হয়তো নজর রাখছে কেউ। মজা দেখছে। সে কিছু বুঝে উঠবার আগেই জানালার ওপাশে চলে যেতে হবে। তারপর যা হয় হোক। কিন্তু জানালার দিকে গেলে ওকে ঠেকানো হতে পারে। লড়বার সাধ্য নেই ওর এখন। কৌশল করতে হবে।

টলতে টলতে ঘরে ঢুকল রানা, শরীরটাকে ইচ্ছে করেই জানালার দিকে পড়তে দিল। পড়ে থাকল কিছুক্ষণ। শক্তি সঞ্চয় করতে চাইছে। উঠল আবার। বিছানার দিকে এক পা বাড়িয়ে আবার পড়ে গেল। জানালাটা কাছে চলে এসেছে। এবার!

ঝট করে উঠে দাঁড়িয়েই এক টানে জানালার স্লাইডিং কাঁচ সরিয়ে দিয়ে নীচে তাকাল রানা। তিরিশ-চল্লিশ ফুট নীচে সাগরের কালো পানি দেখতে পেল ও। দুর্গটা সাগর থেকে কতোটা দূরে? লাফ দিলে তীরে আছড়ে পড়বে ও? কোনও কার্নিস নেই জানালার তলায়। সাগরের পানি ওখানে কতটা গভীর?

পিছনে দরজা খুলবার আওয়াজ পেল রানা। এখন আর ভাবনার সময় নেই। জানালা টপকে লাফিয়ে পড়ল রানা। দুর্গের দেয়াল উপরে উঠে যেতে দেখল ও আবছা ভাবে। শরীরটা পাক খাচ্ছে ওর। ডিগবাজি খেল বারকয়েক, তারপর ধড়াস করে পড়ল পানিতে। জোর একটা ঝাঁকি অনুভব করল ও সারা শরীরে। বড় করে শ্বাস নিল রানা। একগাদা নোনা জল ঢুকে গেল ওর ফুসফুসে। খচ্ করে ব্যথা লাগল বুকে। পরমুহূর্তেই চারপাশ থেকে ধেয়ে এলো গাঢ় অন্ধকার। জ্ঞান হারাল মাসুদ রানা।

বারো

কে যেন ওর জিভটা গোড়া থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। ঝাঁকি খেল রানার দেহ। বমি করতে শুরু করল ও। কেউ ওর পিঠের উপর চেপে বসে আছে, দানবীয় শক্তিতে ওর ফুসফুসে

বারবার চাপ দিচ্ছে। ফুসফুস ফাটিয়ে ওকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে না কি লোকটা? বারবার প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হচ্ছে। লোনা জল বমি করতে শুরু করল রানা। বমির ফাঁকে চোখ মেলল। অন্ধকার নেমেছে চারপাশে। আকাশে মিটমিট করছে নক্ষত্রগুলো। দূরে শহরের টিমটিমে আলো দেখতে পেল। শুনতে পেল কে যেন চিৎকার করে বলছে, 'তাজিক, তাজিক, অসুস্থ বাচ্চার মতো বমি করছে এফেন্দি! শ্বাস নিচ্ছে এফেন্দি! চাপ দাও আরও! চালিয়ে যাও!'

ওর পিঠের উপর বসে থাকা লোকটা হেঁড়ে গলায় বলল, 'নিজের জিভ বন্ধ করে এফেন্দির জিভ ধরে টান লাগাও, বাপজান! ঠিক মতো টান দাও। এফেন্দি বাঁচলে আমরা বহুত বকশিশ পাবো।'

শরীর মুচড়ে পিঠের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকা লোকটাকে নামিয়ে দিল রানা। বিস্মিত হলো ও প্রায় পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছে দেখে। শক্তি ফিরে এসেছে দেহে। বুঝতে পারছে বসফরাসের নোনা পানি অনেক গিলেছিল ও, তারপর এরা ওকে বমি করানোয় শরীর থেকে অবশিষ্ট মরফিন বেরিয়ে গেছে। এতোটাই সজীব লাগছে যে ওর মনে হলো মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। দেখতে পেল, কাঠের পাটাতনে একগাদা সদ্যমৃত মাছের উপর পড়ে আছে ও। দু'জন লোক ওকে বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখছে। তাদের একজন বুড়ো, অন্যজন পালোয়ানের মতো এক যুবক। যুবকই ওর পিঠে চড়েছিল। মাছের উপর রাখা একটা টর্চ জ্বলছে, সেই আলোতে রানা বুঝতে পারল ও আছে একটা দাগলিয়ান বা মাছধরা নৌকার বাড়তি পাটাতনে। এখান থেকেই জাল ছুঁড়ে দেয় তুর্কি জেলেরা। খেয়াল করল, তীর থেকে শ'খানেক গজ দূরে আছে নৌকাটা।

বুড়ো কুঁজো জেলের গাল ভরা খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। তাপ্পিমারা একটা প্যান্ট পরে আছে সে, গায়ে ভারী একটা সোয়েটার। হাসতেই তার ভাঙা ভাঙা আধখাওয়া, পোকাধরা দাঁতগুলো দেখা গেল। 'তুমি বেঁচে আছো, এফেন্দি! আল্লাহ্ মহান! জাল ফেলতেই পেয়েছি তোমাকে, বুঝতে পারছ? মাছ তুলছিলাম, এমন সময় তুমি উঠে এলে। সবচেয়ে বড় মাছ, এফেন্দি! আমরা ভেবেছিলাম তুমি মরে গেছ।'

যুবক হাসল। 'আমি তাজিক, ফার্স্ট এইড জানি। বাপজানকে বললাম তোমার জিভ টেনে ধরতে, আর আমি দিলাম ফুসফুসে চাপ। বাপজান যেমন বলল, আমরা ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছ, এফেন্দি! আল্লাহ্ সত্যিই মহান।'

'আমিও ভেবেছিলাম আমি মারা যাব।' উঠে দাঁড়াল রানা। একশো গজ দূরের তীরের দিকে তাকাল ও। বসফরাসের তীরে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো দুর্গটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এদিকটা অন্ধকার, শুধু তিনতলার একটা জানালায় উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। ওখানেই নিশ্চয়ই মিটিং করছে ডক্টর ফ্রাঞ্জ হার্টয তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে। দুর্গের চারদিকে চারটে টাওয়ার। কোনও সন্দেহ নেই ওটাই ডক্টর ফ্রাঞ্জ হার্টযের দুর্গ। ওকে নিশ্চয়ই তন্ন তন্ন করে খোঁজা হচ্ছে এখন! তবে বেশিক্ষণ খুঁজতে যাবে না। ডক্টর ফ্রাঞ্জ হার্টয ধরেই নেবে এতোক্ষণে মারা গেছে ও, বসফরাসের স্রোত ওর লাশটাকে পৌঁছে দিয়েছে মারমারা সাগরে।

তীরে দাঁড়ানো গম্ভীরদর্শন দুর্গটা আঙুল তুলে দেখাল রানা। ওটার পাশে খেত। খেতের ওপারে একটা ব্যস্ত রাস্তা দেখতে পাচ্ছে ও, গাড়ির আলো আসছে যাচ্ছে। 'দুর্গটা কি হাসপাতাল?'

বুড়ো জবাব দিল, 'হ্যাঁ, হাসপাতাল। গরীবদের চিকিৎসা বিনা পয়সায় করে ওখানে। ওটা চালায় খুব ভালো এক এফেন্দি। গরীবদের খুব দেখে।'

সচেতন হলো রানা। দুই জেলে ওর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। বোধহয় তারা ভাবছে ও পালিয়ে আসা কোনও পাগল রোগী, স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে পড়েছে। সাইকো, অ্যাডিক্ট বা অ্যালকোহলিক ধরনের কিছু ও। আর দেরি করা ঠিক হবে না, বুঝতে পারছে রানা। মিটিঙের কথা কী যেন বলছিল ডক্টর ফ্রাঞ্জ হার্টয? ওখানে মাওলানা আব্দুল হামিদও নিশ্চয়ই থাকবে। তাকে বন্দি করবার একটা সুযোগ হয়তো পাবে ও। জেলেদের বলল ও, 'ফিরে এসে অনেক বকশিশ দেব তোমাদের আমি। এখন আমাকে যেতে হচ্ছে।'

কথাটা বলেই ডাইভ দিল রানা বসফরাসে। দুর্গের দিকে সাঁতরাতে শুরু করে পিছনে শুনতে পেল জেলেদের কথা। 'পাগল এফেন্দি! যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই যাচ্ছে আবার। এর কাছ থেকে বকশিশ আশা করা যায় না।'

'ঠিক,' সায় দিল অন্যজন। 'ওই এফেন্দির ধারণা ও দুনিয়া কিনে ফেলতে পারবে। আল্লাহ্ বেচারার মাথায় বাড়ি মেরেছিলেন বোধহয়।'

ঘাড় ফেরাল রানা, দেখল জেলেরা আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তাদের জাল নিয়ে। মৃদু হেসে সাঁতারে মন দিল ও। তীরের কাছে পৌঁছে গতি কমাল, তারপর পানিতে স্থির হয়ে দাঁড়াল, মাথাটা প্রায় ডুবিয়ে রেখেছে। দুর্গে ঢুকবার পথ খুঁজছে ওর অভিজ্ঞ দু'চোখ।

অবশেষে ওটা দেখতে পেল ও। স্টিলের জালের তৈরি একটা ওয়াটার গেট, ওপাশে চিকন একটা খাল, সোজা চলে

গেছে দুর্গের তলায়। একটা প্যাডলক আটকানো আছে গেটে। খালটা এখন আর ব্যবহার করা হয় বলে মনে হলো না ওর। অনেক আগে হয়তো দুর্গের বড়লোক মালিক এপথে বোটে করে ইস্তাম্বুল যেত।

গেট টপকে ওপাশে চলে গেল রানা। খালটা অগভীর, তলার কাদায় পা ঠেকে গেল ওর। বুক সমান পানির ভিতর দিয়ে হেঁটে এগোল ও। দুর্গের বেযমেন্টের কাছে পৌঁছুতেই মানুষের গলার আওয়াজ পেল ও। বুট জুতোর খটখট আওয়াজ হচ্ছে পাথরের মেঝেতে। কান পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে দিল রানা, স্থির হয়ে দাঁড়াল। শ্বাস আটকে ফেলেছে। মূর্তির মতো অপেক্ষা করছে।

ডক্টর ফ্রাঞ্জ হার্টযের প্রহরীদের দু'জন, পরনে সাদা প্যান্ট আর সাদা জ্যাকেট। দু'জনই সুঠামদেহী। তাদের একজনের হাতে একটা টর্চ, অবহেলার সঙ্গে ওটার আলো ফেলছে সে খালের দু'ধারের বাগানে।

'পাগলের কাণ্ড,' বলল তাদের একজন। 'গাধাটা যদি বসফরাসে পড়ে থাকে তা হলে স্রোতের টানে এতোক্ষণে অনেক দূরে সরে গেছে তার লাশ। আমি তো বলব, সী অভ মারমারায় হতভাগার লাশটা পাওয়া যাবে খুঁজলে। ডক্টর বাধ্য না করলে এখন আমরা কোয়ার্টারে বসে আরাম করে রাকি গিলতে পারতাম।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করল অপরজন। 'রাকি তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। এফেন্দিও পালাতে পারবে না। শীতল পানিতে মাছের খাবার হতে শুরু করেছে সে এতোক্ষণে।'

'ঠাণ্ডা লেগে গেছে আমার,' বলল প্রথমজন। 'রাকি দরকার। চলো, যাওয়া যাক।'

'এক মিনিট।' রানা যেখানে লুকিয়ে আছে সেখানে খালের

কালো পানির উপর টর্চের আলো ফেলল প্রহরী। আস্তে করে ডুব দিল রানা। এরকম ঘটতে পারে আশা করেছিল, কাজেই দমের অভাব হলো না। প্রায় চার মিনিট শ্বাস আটকে পানির তলায় থাকতে পারবে ও। চোখ খোলা রেখেছে রানা, পানির উপর আলোর আবছা প্রতিফলন দেখতে পেল। তারপর নিভে গেল আলোটা। আবার পানির উপর মাথা জাগানোর আগে আরও দুই মিনিট অপেক্ষা করল রানা। আরেকজন প্রহরীকে দেখতে পেল, এ সশস্ত্র, দু'পাশে তাকাতে তাকাতে দুর্গের আরেক প্রান্তে চলে গেল লোকটা।

কালো আর্চওয়েের তলা দিয়ে সাঁতরে এগোল রানা। সামনেই ল্যান্ডিং প্ল্যাটফর্ম থাকবার কথা। খালটা বেঁকে দুর্গের তলায় চলে গেছে।

ল্যান্ডিং প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত আসছে একজন গার্ড, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি পার হয়ে চলে যাচ্ছে দুর্গের সামনে। লোকটা সিঁড়ি পার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর পানি ছেড়ে উঠে ঘাসে পা মুছল। প্যান্ট চিপে নিল। এবার দৌড়ে উঠতে শুরু করল ও সিঁড়ি বেয়ে। গার্ড ফিরে আসবার আগেই দোতলার ল্যান্ডিঙে পৌঁছে গেল ও। মনে মনে আশা করল, প্রায়ান্ধকারে ওর গা থেকে পড়া পানির ছোপ চোখে পড়বে না লোকটার। ল্যান্ডিং ঘুরল রানা। এখন লোকটা ওকে আর দেখতে পাবে না। তিনতলায় উঠতে শুরু করল রানা।

তিনতলার চারটে অন্ধকার ঘর পার হলো ও। পাঁচ নম্বর ঘরটাতে আলো জ্বলছে। ভারী ভেলভেটের পর্দা ঝুলছে ঘরের ফ্রেঞ্চ জানালায়। পর্দার ফাঁক দিয়ে ভিতরটা স্পষ্ট দেখতে পেল রানা। ডক্টর ফ্রাঞ্জ হার্টয ছাড়াও ঘরে আরও পাঁচজন লোক রয়েছে। ডক্টর বসেছে টেবিলের এক মাথায়, অন্য মাথায়

দাড়িওয়ালা মাওলানা আব্দুল হামিদ। মাঝে টেবিলের দু'দিকে বসা লোকগুলো অপরিচিত। তবে তাদের চেহারাই বলে দিচ্ছে অপরাধ জগতের মানুষ। এরাই সম্ভবত সিন্ডিকেটের মাঝারী গোছের নেতা।

ডক্টরের সামনে টেবিলে ওর ওয়ালথার, স্টিলেটো, বুল হাডসনের হার্ডডিস্ক আর সায়ানাইড গ্যাস বোমাটা দেখতে পেল রানা। মার্বেল আকৃতির বোমাটা সাবধানে নাড়ছে ডক্টর।

আব্দুল হামিদ বলে উঠল, 'তা হলে কথা তো হয়েই গেল। যেহেতু আমার হাতে পৌঁছোনোর আগেই ড্রাগের চালান নষ্ট হয়ে গেছে সেইহেতু সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিচ্ছেন আপনারা। তিনমাস পর আরেকটা চালান আমাকে দেবেন।'

'নিশ্চয়ই,' বোমাটা হাত বদল করল হার্টয। 'আপনি এ-ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন। কথার বরখেলাপ হয় না আমাদের।'

দরজার কাছে চলে এসে নবে হালকা মোচড় মারল রানা। তালা বন্ধ করা নেই। সামান্য ফাঁক করল ও দরজাটা। ওর সবচেয়ে কাছে আছে ফ্রাঞ্জ হার্টয। আর তার হাতে আছে সায়ানাইড গ্যাস বোমাটা। ওটা রানার দরকার। একবার গ্যাস বোমা আর ওয়ালথারটা হাতে পেলে এদের বন্দি করতে পারবে ও। বেঁধে রেখে পুলিশে খবর দেওয়া যাবে। হার্ডডিস্কটা কাজে আসবে তখন।

তৈরি হয়ে নিল রানা, তারপর নিক্ষিপ্ত তীরের মতো ছিটকে ঢুকল ঘরে। এক লাফে পৌঁছে গেল ডক্টর ফ্রাঞ্জ হার্টযের পাশে। ওকে দেখে হুড়মুড় করে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল লোকটা। হাতে এখনও মার্বেল আকৃতির গ্যাস বোমা। ওই হাতের কব্জিটা গায়ের জোরে খপ করে ধরল রানা, থাবা মারল বোমাটা নিয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু কব্জি বেশি শক্ত করে ধরা হয়ে গেছে ওর। মড়মড়

করে উঠল হার্টযের শুকনো হাড়। ব্যথা পেয়ে হাত থেকে বোমাটা ছেড়ে দিল ডক্টর। কার্পেটবিহীন মেঝেতে পড়ে ঠুস করে ফাটল কাঁচের গোলক। সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস আটকে ফেলল রানা।

এদিকে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়েছে সিন্ডিকেটের চার ষণ্ডা। দু'পা এগোনোর আগেই ধড়াস করে পড়ে গেল তারা। মেঝেতে গড়াচ্ছে প্রচণ্ড কষ্টে। রানার গায়ে ঢলে পড়ল ডক্টর ফ্রাঞ্জ হার্টয, তারপর ঠেলা খেয়ে পড়ে গেল। এখনও চেয়ারে বসে আছে আব্দুল হামিদ, দু'হাতে দাড়ি আর গলা চেপে ধরে কী যেন বলতে চেষ্টা করল। কথাটা বুঝতে পারল না রানা।

অল্প অল্প কাঁপছে তীব্র বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত লোকগুলো, ক্রমেই চলে যাচ্ছে মৃত্যু-সেতুর ওপারে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবে সবাই। টেবিল থেকে ওয়ালথার, স্টিলেটো আর হার্ডডিস্কটা নিয়ে নিল রানা, একটা লাশ বাছাই করল, তারপর ওটাকে ছেঁচড়ে নিয়ে বেরিয়ে এলো ঘরটা থেকে অন্ধকার করিডরে। পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল।

সিঁড়ির কাছে শুধু একটা ডিম লাইট জ্বলছে। সেই আলোয় মৃত লোকটার পোশাক খুলতে শুরু করল ও, পাঁচ মিনিটের মাথায় পরে নিল নিজে। একটু আঁটো হলো, তবু এই দিয়েই আপাতত কাজ চালাতে হবে। জুতোটা কিছুতেই হলো না। সাদা শার্ট, নিট টাই আর কালো প্যান্ট পরা একজন মানুষ ও, যার জুতো নেই। এ নিয়ে মাথা ঘামাল না রানা, জুতো ওর দরকার নেই। হেঁটে ইস্তাম্বুলে ফিরবার কোনও ইচ্ছে নেই ওর। লাশের কাছ থেকে টার্কিশ পাউন্ডের মোটা একটা বান্ডিল পেয়েছে ও, ওটা ব্যবহার করে ট্যাক্সি বা রেন্টাল কার পাওয়া যাবে। এখন ও কোথায় আছে সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আছে ওর। বসফরাসে, ইস্তাম্বুল থেকে দশ মাইল উত্তর-পুবে। স্যানাটোরিয়ামের সামনে ব্যস্ত রাস্তায় অনেক

গাড়িঘোড়া দেখেছে, মনে পড়ল ওর। ওখানে দাঁড়ালে হয়তো লিফট পাওয়া যাবে। এখন প্রথম কাজ এখান থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়া।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল রানা, দেড়তলায় এসে থামল। গার্ড লোকটা এক পাক ঘুরে চলে যেতেই নিঃশব্দে চলে এলো ও খালের পাড়ে। নেমে পড়ল পানিতে। এক হাত উঁচু করে রেখেছে যেন হার্ডডিস্ক না ভেজে। স্টিলের গেট টপকে সাঁতরাতে শুরু করল ও দুর্গের সীমানা প্রাচীর লক্ষ্য করে। ওটা পেরিয়ে তীরে উঠল। খেত মাড়িয়ে পৌঁছে গেল রাস্তার ধারে। ক্লিনিকের গেট থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে এসে একটা স্পোর্টস কার দেখল ও। ক্লিনিকের দিক থেকে দুর্গ পাশ কাটিয়ে আসছে স্পোর্টস কার। ক্রমেই গতি বাড়ছে গাড়িটার। গর্জাচ্ছে ওটার শক্তিশালী ইঞ্জিন।

লিফট চাওয়ার জন্য বুড়ো আঙুল দেখাল রানা। রাতের আঁধারে হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় ওকে জ্বলজ্বলে একটা হলদে কাকতাড়ুয়ার মতো দেখাল।

রাস্তার উপর উঠে এসে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে রানা। গাড়িটা গতি কমাচ্ছে না। গনগনে আগুনের মতো জ্বলছে হেডলাইট, আকৃতিটা আরও বড় আর উজ্জ্বল হচ্ছে দ্রুত। খুব কাছে এসে গেছে গাড়িটা, থামছে না। হয় ড্রাইভার মাতাল, নইলে ইচ্ছে করে ওকে খুন করতে চাইছে!

একেবারে শেষ মুহূর্তে পাশের খাদে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করল রানা। তার আগেই খেয়াল করেছে ড্রাইভার স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে কুস্তি লড়ছিল। গা রী-রী করা তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে অর্ধেক রাস্তায় আর অর্ধেক কাঁচামাটিতে ব্রেক কষে থামল গাড়িটা। তখনও স্টিয়ারিং হুইল

সামলাতে ব্যস্ত ড্রাইভার। তারপর নামল সে। হাইহিলের টিকটিক আওয়াজ তুলে এগিয়ে আসছে। খাদ ছেড়ে উঠে এলো রানা। গাড়ির টেইললাইটের আলোয় দেখতে পেল ড্রাইভার একজন মহিলা। এক হাতে তার হুইস্কির বোতল। টলছে মাতালের মতো। রানার সামনে এসে দাঁড়াল, তাল রাখতে ওর কাঁধে এক হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু হয়নি তো তোমার? আমি দু-দুঃখিত। তোমাকে দেখতেই পাইনি।'

'এ অবস্থায় গাড়ি চালানো আপনার ঠিক হয়নি,' বলল রানা। 'ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

'আমি তো বলেছি আমি দুঃখিত,' ঠোঁট ফোলাল মেয়েটা। 'তোমার ক্ষতি হোক চাইনি। আসলে দেখতেই পাইনি তোমাকে। একটা ড্রিঙ্ক নাও, মাফ করে দাও আমাকে, কেমন? কোথায় যাবে তুমি, বলো। পৌঁছে দেব আমি।'

'ইস্তাম্বুল। জরুরি কাজ আছে ওখানে আমার।'

মাথা নাড়ল লালকেশী। 'সরি, হানি, আমি ইস্তাম্বুল যাচ্ছি না, বাড়ি ফিরছি। প্লাজ বিচে আমার বাসা। ব্ল্যাক সি'র তীরে। সুন্দর একটা ভিলা। যাবে আমার সঙ্গে?' রানার গায়ের সঙ্গে সেঁটে এলো যুবতী। তার দেহের মিষ্টি সৌরভ রানার নাকে এসে লাগল।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু তুমি তো ইস্তাম্বুলের দিকে যাচ্ছিলে। জানতে না?'

'ইস্তম্বুলের দিকে যাচ্ছিলাম?' রানার দিকে সবুজ চোখ মেলে চাইল মেয়েটা। 'ইস্তাম্বুলের দিকে?' খিলখিল করে হেসে উঠল সে, ঠোঁট ওল্টাল। 'ছিঃ, আমি ভেবেছিলাম বাড়ি ফিরে চলেছি। লিডোতে ড্রিঙ্ক করছিলাম। দুঃখ ভোলার চেষ্টা। ভুল দিকে বাঁক নিয়েছি তা হলে!'

প্লাজ বিচে যেতে পারলেও মন্দ হয় না, ভাবছে রানা। এই অবস্থায় ইস্তাম্বুলে ঢুকলে কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ে যেতে পারে ও।

তারচেয়ে প্লাজ বিচে গিয়ে ধাতস্থ হয়ে ফিরতে পারে ও। হাইডআউটে ফোন করে রাশেদিকে সব জানিয়ে দিলেই চলবে।
'আমি রানা, মাসুদ রানা,' হাত বাড়িয়ে দিল ও।

'ওহহো, আমার নামই তো বলা হয়নি,' হাসল যুবতী। 'আমি রায়ানা রনসন।' আরেক চুমুক গলায় ঢালল সে বোতল থেকে। এক হাতে রানাকে জড়িয়ে ধরল। 'বাবা-মা বেড়াতে গেছে বলে ভিলা একদম খালি। আশা করি তোমার খারাপ লাগবে না?'

'ভিলায় ফোন আছে তো?'

'নিশ্চয়ই! দুটো আছে। আমাদের গরীব মনে করেছ? ইচ্ছে করলে তুমি দুটোই ব্যবহার করতে পারবে।'

'আমিই ড্রাইভ করছি,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। মেয়েটাকে পৌঁছে দিয়ে এই গাড়ি নিয়েই ইস্তাম্বুলে ফিরতে পারবে ও। গাড়িটার ব্যাপারে পুলিশকে জানিয়ে দিলেই চলবে, তারা ওটা পরে ফেরত দিতে পারবে।

ড্রাইভিং সিটে বসেই অ্যালকোহলের গন্ধ পেল রানা। আরও কীসের পরিচিত একটা গন্ধ যেন আছে গাড়ির ভিতর। পিছনের সিটে হাত দিয়ে দেখল ও, জায়গাটা এখনও ভেজা। হাতটা নাকের কাছে আনতেই মদের গন্ধ পেল। পিছনের সিটে মদ ফেলা হয়েছে। ওখানে পেটমোটা একটা ব্যাগও পড়ে আছে। এক চিলতে রহস্যময় হাসি ক্ষণিকের জন্য দেখা দিল রানার ঠোঁটে।

বিনা আপত্তিতে রানার পাশে এসে বসল রায়ানা রনসন। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হলো রানা। পনেরো মিনিট নীরবে কাটল, তারপর ভ্যানিটি ব্যাগে হাত ভরল রায়ানা রনসন। শিকাগোর তৈরি ফাস্টঅ্যাক্ট নেইলপলিশ রিমুভারের এসটোনের গন্ধটা আরও বেশি করে পেল রানা। সঙ্গে সঙ্গে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল রানা, প্রায় জায়গায় দাঁড় করিয়ে ফেলল গাড়ি। হঠাৎ গতি কমে যাওয়ায় মেয়েটার মাথা ড্যাশবোর্ডের সঙ্গে বাড়ি খেল। মুহূর্তের জন্য তাকে

বিবশ মনে হলো। ভ্যানিটি ব্যাগটা হ্যাঁচকা টানে নিয়ে নিল রানা, ওটা হাতড়ে একটা চকচকে ধারাল পিউমা ক্ষুর বের করে আনল। ওটা দূরে সরিয়ে আরেক হাতে রায়ানা রনসনের চুলের গোড়া ধরে টান দিল ও। খসে এলো লালচে চুল। নীচে কালো চুল পুরুষদের মতো করে ছাঁটা।

'হ্যালো, রনি রুথলেস,' কঠোর শোনাল রানার কণ্ঠ। 'কিছু বলার আছে তোমার?'

'না।' যুবতীর চোখ দুটো যেন জ্বলছে।

'মোস্তাককে তুমি খুন করেছ।' অভিযোগ করছে না রানা, মনে করিয়ে দিচ্ছে।

'ও একটা হাঁদা ছিল।'

'খুব ভালো মানুষ ছিল ও।'

'কচু! তিনমাস আগে তোমাদের অফিস থেকে পনেরো দিনের ছুটি নেয় ও। তখন ওকে আটকে রেখে দশদিনে আমরা ওকে অ্যাডিক্ট করে তুলি। প্রচুর তথ্য দিত নেশা করলে। তার মাধ্যমে অনেক খবর পেয়ে যেতাম আমরা। ওর দেয়া তথ্য পেয়েই সহজে খুন করতে পেরেছিলাম তোমাদের এজেন্টদের। পুরোপুরি ড্রাগ নির্ভর একটা লোক ছিল মোস্তাক। শুধু শেষ দিকে কিছু তথ্য গোপন করতে পেরেছে সে। তোমাকে গুরু মানত, কিন্তু মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল তুমি কবে কীভাবে আসছ। আসলেই একটা হাঁদা ছিল ও। ড্রাগ ওকে চাকর বানিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু এসব কথা কীসের জন্য, মাসুদ রানা? তুমি তো আমাকে খুন করবে।'

'পুলিশের হাতে তুলে দেব তোমাকে। অবশ্যই সমস্ত প্রমাণ সহ। যদি অপরাধী সাব্যস্ত হও তা হলে ফাঁসি হবে তোমার। এই সুযোগটা তোমাকে দেব আমি, যদিও কোনও সুযোগই তোমার প্রাপ্য হয় না।।'

আনমনে মাথা ঝাঁকাল রায়ানা রনসন। গাড়ির ভিতরের বাতিটা জ্বেলে দিল রানা। লক্ষ করল মেয়েটার সবুজ চোখে আশার আলো দেখা দিয়েছে। এখনই মারা পড়বে না বুঝে সাহস ফিরে আসছে তার। সতর্ক হয়ে উঠল রানা আরও।

'তুমি কথা দিচ্ছ আমাকে খুন করবে না?'

'কথা দিচ্ছি আমি খুন করব না।' মেয়েটা সাহস ফিরে পাচ্ছে কেন? ওর আস্তিনের ভাঁজে আরও কোনও কৌশল নেই তো? 'এবার বলো কীভাবে ছদ্মবেশ নিতে।'

'সোনালী উইগ পরলেই আমি হয়ে যেতাম মেরিলিন হিউলেট। লাল উইগটা রায়ানা রনসন হতে ব্যবহার করতাম। চোখে লাগাতাম সবুজ কন্ট্যাক্ট লেন্স। আর প্যান্ট-ডিনার জ্যাকেট পরে বুকে স্ট্র্যাপ আটকে নিলেই রনি রুথলেস। খুব সহজেই মেয়ে হিসেবে শিকারের কাছে চলে যেতে পারতাম, তারপর কাজ সারতাম পুরুষ হিসেবে।'

'মোস্তাককেও নিশ্চয়ই সহজেই মারতে পেরেছ?'

অপ্রকৃতিস্থের মতো হাসল রায়ানা রনসন। 'খুব সহজে। ড্রাগের জন্য পাগল ছিল ও। ড্রাগ দেব এই অপেক্ষায় আমাকে বিশ্বাস করে বসে ছিল সে মারা যাবার আগে। স্টানার অফিসে ফোন করে বলে দেয় তুমি ওখানে যাবে। ড্রাগ চাইছিল আমার কাছে। ড্রাগ খুব দরকার ছিল মোস্তাকের।'

'পোস্ট মর্টেম করে সিরিঞ্জের অনেক দাগ পাওয়া গেছে ওর দেহে,' আপনমনেই বলল রানা। 'তুমি নিজের হাতে ওকে খুন করেছিলে?'

'অবশ্যই! ড্রাগ ওর এতো দরকার হয়ে পড়েছিল যে কাঁপছিল ও থরথর করে। খুন করে ওকে চিরতরে মুক্তি দিয়েছি আমি।'

রানার মনে পড়ল চিকা মোস্তাকের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের সময়টা। তখন মোস্তাকের হাত কাঁপতে দেখে ও মনে করেছিল

নার্ভাসনেসের কারণে অমন হচ্ছে। ‘তুমি যখন লেডি স্টানাকে খুন করছ তখন তোমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে ও, তোমাকে জানিয়ে দেয় ওর গাড়ি কোথায় আছে। স্টানাকে খুন করে পোশাক বদলাও তুমি, তারপর মোস্তাককে গিয়ে হত্যা করো। ও নিশ্চয়ই তোমাকে মেরিলিন হিউলেট নামে চিনত? মোস্তাককে খুন করে আবার ফিরে আসো আমার ব্যবস্থা করতে। ব্যর্থ হয়ে আজকে গাড়িচাপা দিয়ে মারতে চেয়েছিলে।’

‘ব্যর্থ হতাম না,’ শান্ত গলায় বলল রায়ানা রনসন। ‘ডক্টর হার্টয আপত্তি না করলে দুর্গেই তোমার গলা দু’ফাঁক করে দিতাম।’ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল হঠাৎ সে। মুখ দিয়ে তীক্ষ্ণ একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো তার। ‘উহ্!’

‘কী?’ জিজ্ঞেস করল রানা। সতর্কতায় কোনও ঢিল দিল না।

‘পায়ে খিঁচ ধরেছে!’ পায়ের পাতার কাছে হাত নিয়ে গেছে রায়ানা রনসন, একটা হাইহিল খুলে ফেলল। ওটা মোচড় দিতেই জুতোর সোলের ফাঁক থেকে বেরিয়ে এলো তীক্ষ্ণধার একটা স্টিলেটো। হিলটা হাতলের কাজ করছে। রানার উপর উন্মাদিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

হাতটা ধরে ফেলবার পরও পাঁজরে খোঁচা খেল রানা। ক্ষুরটা ফেলে দু’হাতে মেয়েটার হাত ধরতে চেষ্টা করল ও এবার। দানবীর মতো শরীর মোচড়াচ্ছে রায়ানা রনসন, বারবার হাতটা ছোবল মারছে তার। এই সময় তার সিটের আপডাউন নবে চাপ পড়ল। সিটটা শোয়ার উপযোগী হয়ে গেল। তখনও স্টিলেটো রায়ানার হাতে, ওটা সোজা করে ধরবার চেষ্টা করছে সে। হিলটা পিছলে যাওয়ায় ফলাটা তারই দিকে তাক হয়ে গেল। ঠাণ্ডা মাথায় রায়ানার হাতটা গায়ের জোরে তার বুকের দিকে ঠেলে দিল রানা। ঘ্যাঁচ করে বুকে গাঁথল স্টিলেটো। মেয়েটা শিউরে উঠল, টের পেল রানা। চিৎকার করতে হাঁ করল রায়ানা। সুন্দর মুখটা বিকৃত হয়ে

গেছে। কয়েকটা ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল তার দেহ।

পাশের সিটে সরে এলো রানা, দেখল রায়ানা রনসনের বামবুকে, হৃৎপিণ্ডের ভিতর গেঁথে আছে স্টিলেটোর পুরোটা ফলা। হিলটা একটা অদ্ভুত মেডেলের মতো অল্প অল্প দুলছে।

গাড়ি থেকে নামল রানা, রায়ানার লাশটা খাদের ভিতর ফেলে দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে ইস্তাম্বুলের পথে রওনা হয়ে গেল। ঠিক করেছে গাড়িটা কোনও নির্জন রাস্তায় রেখে দেবে। পুলিশ মালিকের নাম-ঠিকানা খুঁজে বের করুক।

এখনও অনেক কাজ বাকি ওর। মেজর জেনারেল রাহাত খানকে রিপোর্ট করতে হবে, হার্ডডিস্কটার কপি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছোবার ব্যবস্থা করতে হবে, নিরাপদে গোপনে বেরিয়ে যেতে হবে তুরস্ক থেকে, তারপর আবার ফিরে আসতে হবে সবকিছু গুছিয়ে নেওয়ার জন্য। আগামী ক'টা দিন দম ফেলবার ফুরসত পাবে না ও। তবে তুরস্ক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে দুই জেলের সঙ্গে দেখা করবে ও। তাদের চেহারা ওর মনে আছে। সাগরে কোথায় তাজিক আর তার বাপজান মাছ ধরে সেটাও জানা আছে। খুশি করে দিতে হবে দু'জনকে।

আপাতত মর্গের নীচের গোপন আস্তানায় ফিরছে ও। ঘুম দরকার ওর। দরকার মন থেকে মিলিকে মুছে ফেলা। কখনও পারবে কি না জানে না ও, তবে চেষ্টা ওকে করতেই হবে।

***

মাসুদ রানা

বিষচক্র

কাজী আনোয়ার হোসেন

আপনি কি চান শত শত কোটি টাকার কোকেন
আর হেরোইনের চালান আসুক বাংলাদেশে,
ধ্বংস হয়ে যাক হাজার হাজার কচি তরুণ-তরুণীর
জীবন, বেআইনী অস্ত্র হাতে পেয়ে হত্যালীলায় মেতে
উঠুক সন্ত্রাসীরা? এসব ঘটুক তা চায় না রানা।
কাজেই যেতে হলো ওকে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে।
কুচক্রী আব্দুল হামিদ কয়েকশো কোটি টাকার
কোকেন আর হেরোইনের চালান আনছে তুরস্ক থেকে।
ড্রাগ কার্টেলের হাতে খুন হয়ে গেছে রানা এজেন্সির
চারজন এজেন্ট।
বিষচক্রের বিরুদ্ধে একাকী লড়াইয়ে নামল রানা।
মৃত্যু আর একচুলও দূরে নেই!